http://www.elearninginfo.in

কালকূট

শাম্ব

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, কথাটা আজ অন্য একটা কথার খেই ধরিয়ে দিল। ধরিয়ে দেওয়া খেই কথাটা আবাশ্য বিপরীত। না-তে আছে হ্যাঁ। ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে। অনেকবার শোনা, আর অনেকবার বলা সেই কলিটাই তাই ফিরে আসে বারে বারে, মন চল যাই ভ্রমণে। কিন্তু কোন্ ভুবনে?

এরকম একটা ধন্দ কখনো কখনো আমাকে পেয়ে বসে। তবে সচরাচর না। ভুবনের কথা এলো যে! না, লোটা কম্বল নিয়ে, আর কর্পনি এঁটে—যাকে বলে 'আপনি আর কর্পনি' সেইরকম, সংসারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে, 'ব্যোম্ ভোলানাথ!' হেঁকে আমি কদাপি দৌড় মারিনি। কেননা, ওটা আমার কাছে দৌড় মারার মতোই। বুলি হলো, আপনি বাঁচলে বাপের নাম!

না, পিতা পিতৃপুরুষের নাম, আমি আমার বাঁচার থেকে ছোট করে ভাবি না। ভাবিওনি। ক্ষয় লয় মৃত্যু, অনিবার্য বলে তাকে জেনেছি। এই জানাটা যে কেবল নিজের এই জীবনকালের মধ্যে, তা যেমন সত্যি, তার থেকেও গভীরতর সত্যের কথাটা না বলে থাকতে পারছি না। ক্ষয় লয় মৃত্যুর সে-এক মহিমময় বর্ণনা, বিষ্ণুপুরাণের ধরণীগীতায় উক্তি করেছেন পরাশর। বলছেন :

তপ্তং তপো যৈঃ পুরুষপ্রবীরৈ-
রুদ্বাহুভির্বর্ষগণাননেকান্।
ইষ্টাশ্চ যজ্ঞা বলিনোঽতিবীর্য্যাঃ
কৃতাস্তু কালেন কথাবশেষাঃ॥

আহা, ওহে জীবন, তুমি আবার আমাকে দিয়ে পুরাণের শ্লোক আউড়িয়ে নিচ্ছ কেন। এ ভাষা আমার অর্জিত না। চলো যাই পণ্ডিতের পদতলে, যিনি ভাষার সিংহদ্বার ভেঙে, গম্য স্রোতে ভাসিয়েছেন পরাশরের সেই মহিমময় বেদন্যাভিভূত বাণী, বাঙলা কথায় ধরণীগীতার সেই সব উক্তি :

'যে-পুরুষপ্রধানগণ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে অনেক বর্ষ যাবৎ তপ আচরণ করেছিলেন, অতি বীর্যশালী যে বলবান ব্যক্তিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন, কাল তাঁদের সকলকেই কথাবশেষ করেছেন। যে-পৃথু অব্যাহত পরাক্রমে সমস্ত লোকে বিরাজ করতেন, যাঁর চক্র শত্রুদের বিদারিত করত, তিনি কালবাত্যাহত হয়ে, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত শিমুল তুলার মতো বিনষ্ট হয়েছেন। যে-কার্তবীর্য সমস্ত দ্বীপ আক্রমণ করে, শত্রুমণ্ডল বিনাশ করে রাজ্য ভোগ করেছিলেন, এখন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর নাম উত্থাপিত হলে, সন্দেহ হয়, তিনি বাস্তবিক ছিলেন কী না। ধিক! দশানন অবিক্ষিত রাঘব প্রভৃতি দিঙ্মুখ উদ্ভাসিতকারী রাজগণের ঐশ্বর্যও কি কালের ভ্রূভঙ্গপাতে ক্ষণমাত্রেই ভস্মসাৎ হয়নি! মান্ধাতা নামে যে-ভূমণ্ডলের চক্রবর্তী-রাজ কথাশরীর প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর কাহিনী শুনে, কে এমন সাধু ব্যক্তি আছেন, যে মন্দচেতা হয়ে নিজের প্রতি মমত্ব করবেন। ভগীরথাদি নৃপতি, সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাঘব, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি সকলেই ছিলেন, এ কথা সত্য। মিথ্যা না। কিন্তু এখন তাঁরা যে কোথায়, (হায়!) আমরা জানি না।'...জানি না, কিন্তু ছিলেন—এই সত্যের বিনাশ নেই। পরাশরের লোটা কম্বল কর্পনি ছিল কি না, ওতে আমারও বেজায় ধন্দ। কারণ, জানি না। তথাপি দেখছি, সেই প্রাচীন

পুরুষপ্রধানদের তিনি ভুলতে পারছেন না। আপনি বাঁচো, বাপের নাম ভোল, আর আপনি কপনি করে দৌড় মারো, আর ধ্বনি জ্বালিয়ে বেল-কাঠ বেহ্মচারীর মতো গায়ে মাখো ছাই, তিনি যে তা ছিলেন না, তার প্রমাণ তাঁরই উক্তি। যাঁদের অস্তিত্বের নশ্বরতা বিষয়ে তিনি উক্তি করেন, তাঁদের স্মরণের, তাঁরা ছিলেন, এ দায় থেকে মুক্তি পান না।

মুক্ত আমিও না। যদিও জানি, আমার বাঁচার থেকে পিতৃপুরুষগণকে ছোট করে ভাবতে পারি না, কিন্তু অবিমিশ্র সুখ কেউ রেখে যাননি এই বংশধরটির জন্য। সংসারকে নিরঙ্কুশ দুঃখের আগার ভাবি না। আর সুখ? প্রয়াগের সেই ঘর-ছাড়া পাগলাবাবার কথা মনে পড়ে যায়। যে-কথা এমন স্পষ্ট করে কোনো গীতায় উচ্চারিত হয়নি। তার আগে একটা কথা কবুল না করলে, নিজেকে যেন কেমন ছলনাকারী লাগছে। সংসারের বাইরের পথে যাঁরাই কপ্নি এঁটে বেরিয়েছেন, মাথায় জটা উঁচিয়ে, গায়ে ছাই মেখে ক্ষ্যাপা হয়ে ফিরছেন, তাঁদের সবাইকে আমি কখনো দৌড় মারার রঙিলা ব্রহ্মচারী বলিনি। তা হলে আমার জীবনে অনেক দর্শন, অনেক বচনবাচন দেখা আর শোনা হতো না।

প্রয়াগের সেই জটা খোলা, উদলা গা, হাসকুটে মানুষটি আমাকে শুনিয়ে-ছিলেন, 'সুখ দুঃখটা কেমন জানিস? প্রয়াগে তীর্থ করলে, আর পকেট ভরে পুণ্যি নিয়ে গেলেই সব শেষ না। সুখদুঃখের মাপ জ্ঞানটা থাকা দরকার। পৃথিবীটাকে দেখে নিয়েছিস্। আহ্, সেই দেখার কথা হচ্ছে না, ঘরে বসে ভুগোল ম্যাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছ তো। তার তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। কেমন কী না। ওটাই হলো সুখ দুঃখের ভাগ। তিন ভাগ জলের মতো দুঃখ, স্থলের এক ভাগ সুখ।'

কত কাল আগের কথা? তেইশ-চব্বিশ বছর তো হলো প্রায়। তখন পশ্চিমের 'মিথ্ অফ সিসিফাস' জানা ছিল না। কথাটা এমন করে মরমে বিঁধেছিল, জীবনের কত জায়গায়, কত ভাবে যে কথাটা বলেছি, নিজেরই কোনো হিসাব নেই। কথাটা এই কারণে মরমে বেঁধেনি, জীবনটা একান্তই দুঃখের অকূল সমুদ্র। বড় অসহায় বোধ করেছিলাম। জীবনকে দেখার সেই দৃষ্টিভঙ্গি, নিদারুণ মনে হয়েছিল। তখনো সুখ বিষয়ে মনের মাত্রাজ্ঞানে আকাঙ্ক্ষার ভাগটা ছিল অনেক বড়। কথাটা শুনে মনে হয়েছিল, জীবন হলো দুঃখের দ্বারা বেষ্টিত। তাকে পাশ কাটিয়ে যাই, এমন কোনো পথ ছিল না। ব্রহ্মাণ্ডের অনিবার্যতার প্রমাণটা একটা প্রতীক। তিন ভাগ জলের ধারা প্রবাহিত স্থলের অভ্যন্তরে নানা নদ ও নদী। তার ওপরে, পন্থ বড় বন্ধুর হে, পন্থ বড় বন্ধুর। তিন ভাগ জল ছিল এক গভীর অর্থবহ সংবাদ। দুঃখ জীবনের সমগ্রতায় অনতিক্রমনীয়। সুখ থাকে দুঃখের কুণ্ডলীতে। নাম তার ঝলকিত দ্যুতি। সামান্য জীবনকালের কয়েকটি স্বপনময় মুহূর্ত মাত্র।

পরবর্তী কালে পশ্চিমের 'মিথ্ অফ্ সিসিফাস' পড়ে, তিন ভাগ জলের প্রতীকটাকে সমার্থক মনে হয়েছিল। আরো পরে বুঝেছিলাম, দুটো ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুটো বিশ্বাস আলাদা, অভিজ্ঞতা ভিন্নতর। অভিশাপ আর বিশ্বের নিয়মের অনিবার্যতায় বেবাক ফারাক।

প্রয়াগের সাধু আমাকে শুনিয়েছিলেন, বিশ্ব নিয়মের একটি অনিবার্যতার কথা! পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। জীবনের তিন ভাগ দুঃখ, এক ভাগ সুখ। এর নাম মন্ত্র তন্ত্র না। দার্শনিকতা? কেউ দাবী করেনি। ভারতের

ঘাটে মাঠে গাছতলায়, এক শ্রেণীর সর্বত্যাগীর (সর্বহারা বলা যায় কী?) মুখে মুখে জন্ম নেয়। এখন বোঝ হে কথা, যে জান সন্ধান। কারোর মাথার দিব্যি নেই।

কিন্তু তথাপি মনে একটা খটকা, প্রাণে লাগে একটা ধন্দের দোলা। এই যে কেবল ভারত ভারত করি, কেবল কি ভারতের মাঠে ঘাটে গাছতলাতেই এমন কথার জন্ম হয়! জগতের আর কোথাও না? ঘাড় ঝাঁকাতে পারি না। শিরে টান ধরে। প্রয়াগের গাছতলা কি প্রাগে নেই? প্রাগের ঘাট সাইবেরিয়ায়? সাইবেরিয়ার মাঠ সাংহাইয়ে? কাস্পিয়ানের কূলে কিংবা অতলান্তিকের বেলাভূমে?

সত্যি মিথ্যা জানি না। অবুঝ মন বলে, আছে। বোঝদার বললে কেউ 'অংখারি' ভাবে, তাই। তবে নিতান্ত অবুঝ মনের কথা না। সেই মহান মেষপালক, গায়ে ছেঁড়া আলখাল্লা, আর এক মুখ দাড়ি নিয়ে মাঠে ঘাটেই তাঁর কথার জন্ম দিয়েছিলেন।

খেই হারালাম নাকি? না। কথা হচ্ছিল, 'মরিতে চাহি না...।' বলতে চাই-ছিলাম, না-তে আছে হ্যাঁ, অন্য কথায়। ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে। কিন্তু কোন্ ভুবনে? ভুবনের কথাটা এলো, আমার ধন্দটাও, অতএব। সেই কারণেই লোটা কম্বল কপ্নির প্রসঙ্গ। কথাটা অনেকবার অনেকভাবে বলেছি, ভ্রমণে যাবো। কিন্তু সংসারটাকে ছাড়িয়ে যাবার কথা কখনো মনে হয়নি। তিন ভাগ জলের সত্যকে জেনেছি বটে, উপলব্ধি অন্য কথা। সেই জানা থেকেই, আমার এক কথা, আমি লোটা কম্বলধারী না। পরিব্রাজক যাঁদের বলে, প্রব্রজ্যা যাঁদের পরিভ্রমণ, আমার মন চল যাই ভ্রমণের সঙ্গে তার মিল নেই কোথাও। বৈরাগ্য যে কখনো অন্তরকে গ্রাস করে না, সে-কথা বলা কঠিন। বৈরাগী হতে গেলেই, সংসারের ধিক্কারটা বড় কঠিন হয়ে বাজে।

তাই কি? আসলে বৈরাগী যে হতেই চাইনি কখনো। সন্ন্যাস আমার জন্য না। লোটা কম্বল নিয়ে যদি দৌড় দিতে পারতাম, তবে আমার থেকে কার বিবেক আর বেশি সাফ্ সুরত্ থাকতো? মনের কথাটা তো গোড়াতেই বলেছি। ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে। কথাটা আরশিতে ফেলে দেখতে গিয়ে তাজ্জব! দেখি, লেখা রয়েছে, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' এই চাওয়া আর না চাওয়ার মধ্যে, যদি আনন্দের ধ্বনি বেজে থাকে, বাজুক না কেন। আরো কি বাজে কোনো আর্তস্বর? অথবা এরই মধ্যে জীবনের অলঙ্ঘিত বিধি, সম্যক জ্ঞানের ধারায় নিয়ে চলে?

না না না, এ বড় পয়জার হে। মনের নানা ব্যাজ। উসব থাকুক গা মনের রাঙচিতের বেড়ায় ঢাকা। আমার এক কথা, ভ্রমি অনুরাগে। আমার হলো অনু-রাগের ভ্রমণ। কিন্তু ওই ভুবনে এবার আমার ঠেক লেগেছে। মন নিয়ে কথা। ঠেক ধন্দ যে কতো, আজতক বলে বলে তার ইতি করতে পারলাম না।

একটা মজার কথা বলি। ছেলেবেলার কৃষ্ণযাত্রার কথা, মন তখনো কুসুমকলি। বিরহিণী রাধার কাছ থেকে কৃষ্ণ বিদায় নেবেন। কিন্তু বিদায় নেবার ইচ্ছা নেই। মানভঞ্জনটা হয়েছে। রাধার দুই সখী দু পাশে। কৃষ্ণ বললেন, 'এবার তা হলে যাই।' বলে পা বাড়ালেন।

সখী বললেন, 'যাই নয়, আসি।'

কৃষ্ণ ফিরে এসে দাঁড়ালেন। রাধা এবং সখীরা অবাক! কী হলো? কৃষ্ণ বললেন, 'বললে যে যাই না আসি। তাই এলাম।'

সখী হেসে বললেন, 'যাই বলতে নেই, যাবার বেলায় আসি বলতে হয়।'

কৃষ্ণ বললেন, 'তাই বুঝি? এবার তা হলে আসি।' যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

সখী বললেন, 'এসো।'

কৃষ্ণ আবার ফিরে এলেন। রাধা এবং সখীরা আবার অবাক! কৃষ্ণ বললেন, 'এসো বললে, তাই এলাম।'

রাধার অনুরাগ আর বিরহ কাতরতা যুগপৎ বাড়ে। সখীরা হাসেন। কৃষ্ণযাত্রার কেষ্টঠাকুরটি বরাবরই চতুর রসিকলাল। আমাদের ক্ষেত্রে বিটলেমি। বুঝতে পারছি না, আমাকে সেই বিটলেমিতে পেলো কী না। ভুবনের ঠেক লাগলো এই কারণে, ভ্রমণে যাবো কোন ভুবনে। হিসাবে দেখছি, ভুবন তিনটি। ত্রিভুবন যাকে বলে।

অনুরাগের ভ্রমণের একটা বৈশিষ্ট্য, ডানায় কাঁপন লেগে যায়। নিষ্পত্র গাছপালা আর বরফের দেশ ছেড়ে পাখিরা যেমন পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে যায় চিরবসন্তের দেশে। তা বলে কি আমার ভ্রমণ কাসপিয়ানের কূল থেকে কুরু পাঞ্চালে? ইস! টিকিটবাবুরা হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেই? মনের পাখায় কাঁপন যতোই লাগুক, আকাশযান জলযান স্থলযান, ব্যতিরেকে উড়বো কিসে? আর সেইসব যানবাহী হলে ফুঁকো ট্যাঁকে মনের পাখনায় মরণ ধরে। সবাইয়ের এক বুলি, ফ্যালো কড়ি মাখো তেল, তুমি যে আমার বড় আপন গো!

না, অমন দূর দূরান্তরের ভ্রমণ আমার কপালে নেই। আমার হলো, দশজনকে নিয়ে ঘর করতে, হঠাৎ গুনগুনিয়ে ওঠা "মন চলো যাই ভ্রমণে/কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে।" কৃষ্ণ হেথায় প্রতীক, এক অরূপ রূপের ঠাঁই। তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, নগর পুরী জনপদের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে ঘরের হাতায় মাঠ থেকেই মোটর বাসে চেপে বসে, ঘরেরই আর এক পিঠে গিয়ে নামো। কোনো এক গাঁয়ের পথে, নয় তো কোনো এক খোয়াইয়ের ঢালুতে। কুন্তী নামেও তো এক নদী আছে, অথবা ক্ষীণধারা সরস্বতীর কূলে বাঁশঝাড়ের ছায়ায় ভ্রমণে চলে যাও। নানুরের পুকুর ধারে, নয় তো ছাতনার ঝোপ ঝাড়ের জঙ্গলে। সোনামুখীতে না গিয়ে, পাঁচমুড়ার গাঁয়ে গিয়ে বসো। থেলো হুঁকোয় ভুড়ুক ভুড়ুক করে, পোড়ামাটির শিল্পী কারিগরদের উঠোনে বসলে কেউ তোমাকে ঠাণ্ডা নিয়ে তাড়া করবে না। গুলবাজী? না। কসম? কসম! এমন অনেক জায়গার নাম করতে পারি। সবই মনে হবে কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগান।

যে যায় এমন ভ্রমণে
কৃষ্ণ থাকেন তার সনে।

আবার কৃষ্ণ? আবার কেন, বারে বারে। বললাম না, ওই নাম হলো প্রতীক। পাবার আশায় সেখানে কেউ যায় না। নিজেকে একটু ধোয়া মোছা সাফসুরৎ করতে যাওয়া। এত কথা কিসের। বলছি, প্রাণের লক্ষ কক্ষে বায়ুর ভারি চাপ। প্রাণে বায়ু চালাচালির নামই ভ্রমণ।

'তা যেন হলো।' তিনি বলেছিলেন, 'ভ্রমণে তোর সঙ্গে না যেতে পারলেও মনটা হালকা হল। কিন্তু খাস কি?'

'খাই কি?'

'হ্যাঁ, খাস কি?'

একে বলে জিজ্ঞাসা! প্রাণের লক্ষ কক্ষে বায়ু চালাচালি তো করছো বাপু, মহাপ্রাণীটির ব্যবস্থা কী? দাঁতকপাটি? যে তাঁর বচন শোনেনি, সে বুঝবে না,

জিজ্ঞাসায় ঝাঁজ কেমন। তারপরেই আবার পাল্টা জিজ্ঞাসা, 'গেরস্তের বাড়িতে পাত পাতিস?'

'আজ্ঞে সে কখনো সখনো। সব জায়গার সব গেরস্ত তো সমান না। আশেপাশের দোকান থেকে চিড়ে মুড়ি মুড়কি কেনা যায়। ময়রার দোকান থাকলে তো কথা নেই। দই মণ্ডা মেঠাইও কিছু মেলে।'

'তুই একটা আস্ত গাধা।'

'আজ্ঞে?'

'হ্যাঁ, বইলাছি, তুই একটা কুড়ের বাদশা। ওতে না আছে মজা, না ভরে পেট। খেটে খেতে পারিস না?'

সেটা কী রকম? জিজ্ঞাসা করিনি, চোখে জিজ্ঞাসা নিয়েই তাকিয়েছিলাম।

'রেঁধে খেতে পারিস না?'

'রেঁধে?'

'হ্যাঁ রে বাঁদর, রেঁধে। তোর বয়সে আমি ওরকম অনেক, ঘর করতে উঠ্‌বন্দী প্রজার মতন বেরিয়ে পড়তাম। সেইজন্যই তোর বেরিয়ে পড়ার খবরে আমি খুশি। কিন্তু আমি তোর মতন ওরকম চিড়ে মুড়ি মণ্ডা মেঠাইতে ছিলুম না, বুঝলি?'

'কিসে থাকতেন?'

'ক্যানে, দোকানে চাল ডাল মেলে না? নুন লঙ্কা তেল? হাঁড়ি মালসা, গেরস্তের বাগানে কলাপাতা?'

'তা তো মেলে।'

'মেলে মানে? মিলবেই। তোকে তো আর কেউ শিল নোড়ায় বাটনা বাটতে বলেনি। বলেছে কি? ত? যা, সব কিনে কেটে যোগাড়জাত্ করে, গাঁয়ের বাইরে গাছতলায় যেয়ে বস্। গাছের শুকনো পাতা ডাল কুড়িয়ে আন্। কিছু না পাস মাটির ঢ্যালা বসিয়েই উনোন সাজা। জল নিয়ে টিপটিপিনি আছে নাকি?'

'আজ্ঞে?'

'বইলছি পেট রুগীদের মতন, এ জল খাব না, সে-জল খাব, ওসব হ্যাপা নাই ত?'

'না।'

'ওইটেই বাঁচোয়া। তবে যা, কাছেপিঠে যেখানে পুকুর টিউবকল যা পাবি, হাঁড়িতে করে জল নিয়ে আয়। চালে ডালে বসিয়ে দে। মালসায় তেলের ছিটা দিয়ে, লঙ্কা ভেজে নে, হাঁড়িতে ঢেলে দে। গাছের ডাল দিয়ে হাঁড়িতে নাড়। ঠিক মতন ফুট খেয়েছে? তা হলে এবার গরম গরম কলাপাতায় ঢাল, আর খা। কেমন লাইগছে?'

'আঁজ্ঞে জিভে জল এসে যাচ্ছে।'

'তব্যা? তা না চিড়া মুড়ি মেঠাই মণ্ডা। এখন তোর আশেপাশে কারা আছে বল্ দিকিনি?'

'আঁজ্ঞে, কই? কেউ নেই তো।'

'গাধা! নিদেনপক্ষে চার-পাঁচটা গাঁয়ের অনাহারী কুকুর তোকে ঘিরে বসে নেই? কাক শালিকের কথা বাদই দিলাম।'

'ইস! সত্যিই তো, মনেই ছিল না দাদা।'

'মনে না রাখলে লিখবি কেমন করে? এবার নিজে খা, ওদের দে। তারপর কী করবি?'

'গাছতলায় শোব?'

'তা শুবি না আরামখোর! শোবার জন্যে তখন একটা জাজিমের কথা মনে পড়বে, তারপরে একটি দাসী।' মনে আছে, হেসে জিভ কেটেছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁর মনে, 'ঢ্যালা মেরে উনোন ভেঙে হাড়ি মালসা ভেঙেচুরে, আর পেছনে তাকানো নয়, চলে যা, নিজের পথে। তোর বয়সে আমি যখন বেরিয়ে পড়তাম, এইরকম করতাম। বেরিয়ে পড়লেই, গায়ে গতরে খাটবি না, পোকা পড়বে যে! তবে ওই দিনান্তে একবার। হাত পুড়িয়ে খাবি, মুখে অমৃতের স্বাদ পাবি। চড়ুইভাতি কি কেবল দঙ্গলে হয়? জঙ্গলে একলা হয় না?'

হয় না আবার? হাতে কলমে পরখ করে দেখেছি। কেবল কি অমৃতের স্বাদই পেয়েছি? আর কিছু না? আরো কিছু। একলা সেই অনুষ্ঠান, এক যজ্ঞের মতো। সেই যজ্ঞের মধ্যে নিজেকে যেন অনেকখানি চিনে নেওয়া যায়। আহা, জানি তোমরা কি ভাবছো। আর তা জেনে আমার এমনি করে বলতে ইচ্ছা করছে, 'পাঠক! তোমাদিগের মনের অবস্থা আমি অনুমান করিতে পারিতেছি। যে-ব্যক্তির সঙ্গে আমার উক্ত প্রকার আলাপাদি হইয়াছিল, তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য, তোমাদিগের কৌতূহল অতি তীব্র হইয়াছে।' বচনদারের বচনেও যদি না বোঝা গিয়ে থাকে, তবে বলি, তিনি কথাশরীর প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি দিগ্‌উদ্ভাসিত সাহিত্য রচয়িতা তারাশঙ্কর—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কথাশরীর প্রাপ্ত হওয়া মানে কী? পণ্ডিতমশাইয়ের কাছ থেকে যথার্থরূপে জেনে নেওয়া হয়নি। কথা-শরীর প্রাপ্ত কি কেবল মৃত্যু? সম্ভবত না। যিনি এখন ইতিহাস তিনি কথা-শরীর প্রাপ্ত হন। দাদা (এই নামেই তাঁকে ডাকতাম। দাদার আগে নাম ধরবার, অন্ততঃ তাঁর ক্ষেত্রে, জিভ আড়ষ্ট হয়ে যেতো। সেটা তাঁর বয়স এবং ব্যক্তিত্ব।) এখন সৃষ্টি জগতের ইতিহাস।

কিন্তু 'আমার সাধ না মিটিল/আশা না পূরিল।' বড় ইচ্ছা ছিল, তাঁর সঙ্গে একবার ভ্রমণে যাই। গ্রামের বাইরে গাছতলায় চাল ডাল হাঁড়ি মালসা নুন তেল যোগাড়জাত করে গিয়ে বসি, মাটির ঢ্যালায় উনোন সাজিয়ে, হাঁড়ি চাপিয়ে দিই। আমি শুকনো কাঠ পাতায় আগুন উস্‌কে তুলবো, তিনি গাছের ডাল দিয়ে হাঁড়িতে নাড়বেন। আর তখন কি গুনগুন করবেন, 'জীবন এত ছোট ক্যানে?'

এই দেখ, আমার প্রাণের বায়ুর ঘরে কেমন হাহাকার করে উঠেছে। ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। কারণ, সে-উপায় যে আর ছিল না। সাধ মেটাতে পারিনি। কালের স্রোত তখন তাঁকে অন্যদিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। একলা চড়ুইভাতির দিন শেষ অভিজ্ঞতাগুলোকে হৃদয়ের জারিত রসে রূপায়ণের একনিষ্ঠ শিল্পী। কর্তব্য আর বয়সের দায় তাঁকে ঘরবন্দী করেছে।

তা-ও বা কতোটা? ঘরে বন্দী হবার লোক কি তিনি ছিলেন। আর একটা ঘটনা বলে নেবো নাকি? এই দেখ, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট, কথায় বলে। আমার সেই অবস্থা। আমি থেই হারাতে বসেছি। তবু মন বলছে, খেদ রেখো না বাপু, যা বলবার ঝটপট বলে ফ্যালো।

হ্যাঁ, তাই বলি। একবার দাদার সঙ্গে গিয়েছি সাঁওতাল পরগণার শিমুল-তলায়। আরো অনেকে ছিলেন। কেন, কী বৃত্তান্ত, সে-সব কথা থাক। আবহাওয়াটা দঙ্গলের চড়ুইভাতির মতোই। দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে, ঠিক হলো তিন মাইল দূরে তিলুয়াবাজারের হাটে যাওয়া হবে বাজার করবার জন্য। আসলে সেও এক ভ্রমণ।

হাটে একটি সাঁওতাল মেয়ে, খাঁচায় পুরে নিয়ে এসেছিল কয়েকটি পায়রা। নতুন পাখনা গজানো নধর পায়রা। সচকিত ভীরু পায়রাগুলো, খাঁচার মধ্যে হাটের ভিড় দেখে ছটফট করছিল। হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, অনেককাল পায়রার মাংস খাওয়া হয়নি। দাদাকে বললাম, 'পায়রা ক'টা কেনা যাক, মাংস খাবো।'

দাদা তাঁর মোটা লেন্সের চশমায়, খয়েরি উজ্জ্বল চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'পায়রার মাংস খাবি?' তারপরে পায়রাগুলোর দিকে তাকালেন। পায়রাদের থেকে চোখ তুলে সাঁওতাল মেয়েটির দিকে। আমাকে বললেন, 'তা হলে কিনে ফ্যাল।'

কিনে ফেলেছিলাম। দাম শুনে তো নিজেকে মনে হয়েছিল, 'ড্যানচিবাবু'। দাদা হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, 'দেখি।'

খাঁচাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তিনি খাঁচার দরজাটি খুলতে খুলতে বলেছিলেন, 'পায়রার মাংস খাবি? খা!' বলে একটি একটি করে পায়রাকে ধরে বাইরে, আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

আমি হাহাকার করতে গিয়ে দেখেছিলাম, সাঁওতাল পরগণার হেমন্তের আকাশে পড়ন্ত বেলার রোদে, চিত্রগ্রীবের দল কেমন রঙ বাহারে উড়ে গিয়েছিল। দাদা তাকিয়েছিলেন আমার মুখের দিকে। না, অনুশোচনার কিছুমাত্র অভিব্যক্তি ছিল না তাঁর চোখে মুখে। বরং মিটিমিটি হাসি। বলেছিলেন, 'আরো পায়রা কিনবি নাকি? চল্ দেখি, হাটে নিশ্চয় আরো পায়রা এসেছে।'

বিক্রয়িনী সাঁওতাল কন্যাটি, আর তার আশেপাশে, ইস্তক আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরাও তখন হাসতে আরম্ভ করেছে। ভ্রমণে এলাম আমি। আকাশ বিহারে গেল কবুতরেরা! কিন্তু হাসিটা তখন আমার ভিতরেও সঞ্চারিত হয়েছে। সেই হলো আর এক রকমের কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে ভ্রমণ!

সত্যি খেই হারালাম নাকি? কথা হচ্ছিল, ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে। ভুবনের কথা এসে গেল, গোলমালটা সেখানে। ত্রিভুবনের কোন্ ভুবনে যাবো? ঝোলা কাঁধে নিয়ে, রেলগাড়িতে বা মোটর বাসে চাপলেই কি ত্রিভুবনের কোনো এক ভুবনে যাওয়া যায়? এবারে আমার ঠেক লেগেছে সেইখানে। এই ত্রিভুবনের সংজ্ঞাটা একটু ভিন্ন রকমের। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, ভ্রমণের এই ত্রিভুবন এবার আমাকে ডাক দিয়েছে। আর এই ত্রিভুবনে যেতে হলে, ঝোলা কাঁধে নিয়ে কোনো যানবাহনে চেপে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

বুঝতে পারছি, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল নামেই অনেক বাংরেজ বাবাজীর মাথায় লগুড়াঘাত লাগলো। অথবা কালকূটের মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে অনেকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। নয় তো হাসি পাচ্ছে। পেতে পারে। তাতেও, হাসতে গেলে কপাল ব্যথার আশংকা আছে, নিবেদন করে রাখছি।

ভেবেছিলাম সরাসরি যাত্রা করবো দ্বারাবতী, যে-স্থানকে লোকে জানে দ্বারকা নামে। স্থান যদি দ্বারাবতী, কাল তবে কলি-সন্ধ্যা, অর্থাৎ দ্বাপরান্তর। কিন্তু কাল এবং যুগের এই বিচারটা বোধহয় অনেকেরই হালে পানি পাবে না। আধুনিক ইতিহাসের কাল গণনার বিচারটা, আমার অনেক আগের পুরুষ থেকেই ভিন্ন পথগামী। যদি বলি পৌরাণিক মতে অষ্টাবিংশ যুগ, তবে এই নিশ্চিত ও অমোঘ কাল গণনা অনেকের কাছে ধাঁধার মতো লাগবে। কারণ দোষ কারো নয় গো মা/

আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। সাহেবরা যে আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন, পুরাণ মানে মাইথলজি, ইতিহাস না। অতএব সে-কাল গণনা অনেকটা রূপকথার মতো। হ্যাঁ, মিথ্যার স্বর্গবাসেও সুখ আছে বই কি! সুখ এই, মেনে নিলে আর পরিশ্রম করতে হয় না।

কিন্তু এ তো হলো তর্কের কথা। ইতিহাস প্রমাণ চায়। তাই প্রমাণ দিই। কাঁধ থেকে ঝোলাটা রেখে, এবার মন চল যাই দ্বারাবতী। সেখানে কে আছেন? বাসুদেব। যাদবশ্রেষ্ঠ, তিনি কেবল নরপতি নন, কালান্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কালের হিসাবটা কী? তাঁর জন্মকালের হিসাবে সময়টা এক হাজার চারশো আটান্ন খৃষ্টীয় পূর্বাব্দ। এই হিসাবটা আধুনিক ঐতিহাসিক কাল গণনা। পুরাণের অষ্টাবিংশ যুগ, কলির সন্ধ্যা। কেউ বলেছেন দ্বাপরান্তর। যীশু খৃষ্টের মতো যদি কৃষ্ণ জন্মাব্দ বা কৃষ্ণাব্দ গণনা হতো, তা হলে এই যীশু জন্মের উনিশশো সাতাত্তর সালকে বলা যেতো তিন হাজার চারশো পঁয়ত্রিশ সাল।

বিশেষ কাল নির্দেশে আরো কিছু অতীতে যাবো নাকি? কিন্তু পণ্ডিত মশাইদের ভ্রূকুটি আর তর্কে যে বড় ভয় লাগে! এই সেদিনই তো রাম-রামায়ণ নিয়ে তর্ক বিতর্কের ধুন্ধুমার লেগে গিয়েছিল। ধুন্ধুমার! কথাটা কতো সহজেই না আমরা কাজে লাগিয়ে ফেলেছি। আসলে ধুন্ধু নামক দৈত্যের যিনি নিধনকারী, তাঁরই নাম ধুন্ধুমার। ধুন্ধির গুণ বটে। বিশেষণকে লাগিয়ে দিলাম ক্রিয়াবাচক শব্দে। তবে আমার প্রণাম সদ্য স্বর্গত আচার্য সুনীতিকুমারকে। প্রণাম রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক মহাজনকে এবং আরো সকলকে। কিন্তু আমি তর্কে নেই। বিদগ্ধজনের রচনার পথ ধরে আমার এবারের যাত্রা।

দেখছি, শ্রীরাম ছিলেন দুই হাজার একশো চব্বিশ খৃষ্টীয় পূর্বাব্দে। তা হলে রামাব্দ ধরতে হয় চার হাজার একশো এক সাল। আর রামের থেকে কৃষ্ণ ছিলেন ছশো ছেষট্টি বছরের ছোট। কিন্তু কী লাভ আমার এই গণনায়? আমি অযোধ্যায় যাবো না। আমার যাত্রা দ্বারাবতীর পথে।

এই যাত্রার আগে, আমাকে আর একবার সেই বাউলের গানে ফিরে যেতে হবে। গানে দেখছি, কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে, 'বাগানে পাঁচজনা মালী/যে যাঁর ঠাঁইয়ে বস্যে আছেন/পাঁচ মাথার মোড় আগুলি'...এখন এই বুঝহ রসিকজন, এই পাঁচজনা মালী কারা, পাঁচ মাথার মোড় আগলিয়ে বসে আছেন? কথায় ধন্দ আছে বটে, কিন্তু দ্বন্দ্ব নাই, এয়াঁরা হলেন বাউলের প্রতীক পঞ্চেন্দ্রিয়। দেহতত্ত্বে এমন প্রতীক বিস্তর। আমার এক কলসীতে নয়টি ছিদ্দরি/কেমনে জল ধরি ভরা কলসীর ভিত্দরি।...এও বোধ হয় সেই নবম দলের নয়টি নাড়ির প্রতীক। এমন প্রতীক কথায় কথায়। ষোল ঘর থেকে চৌষট্টি ঘরও মেলে। আবার ত্রিবেণীতে ডুব দিয়ে, মীন ধরবার জালও বাঁধে।

আসলে, এসব হলো, মূলে যাবার প্রস্তুতি। সিদ্ধির প্রমাণ-পথের দ্বারের যথাযথ খেলা বন্ধ। বলবো নাকি, সাধনার মুখবন্ধ? তা হলে আমার গীত গাইবার সুবিধা হয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বারাবতী যাবার আগে, পুরাণ যে ইতিহাস, তার যুক্তির ধন্দ কিঞ্চিৎ কাটানো দরকার। কাটান করবার আমি কেউ না, স্বয়ং পুরাণকারেরাই তার কাটানদার। পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পুরণকে প্রাচীনকালের বিবরণ জ্ঞানেই অবগত আছেন।

জ্ঞানীর সঙ্গে আমার মতো অর্বাচীনের ফারাক হলো, আমি সংশয়ী। আমার যুক্তি চাই। প্রমাণটা চাই আগে নিজের। খুঁজতে গিয়ে দেখছি, খৃষ্টজন্মকালকে

যাঁরা কালবিন্দু হিসাবে ধরেছেন, কৃষ্ণজন্মকালকে তাঁরা খৃষ্টপূর্বাব্দে ভাবতে আপত্তি করছেন। এ আপত্তিটা কুসংস্কার, কারণ পুরাণকার দেখছি যুগমানের দ্বারা কাল নির্ণয় করেছেন। ফলে তাঁদের বি-সি এ-ডি নেই। একজন বলেন এক হাজার ছেষট্টি খৃষ্টাব্দে রাজা উইলিয়ম ছিলেন। আর একজন বললেন কৃষ্ণ অষ্টাবিংশ যুগে ছিলেন।

সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত পুরাণের কাছে এই পাঁচ বিষয় ইতিহাসের মূল উপাদান। তার বিশ্বাস, যে দেশ প্রথম সৃষ্টে হলো, তখন থেকেই তার হিস্টরি (পুরাণ) বা ইতিবৃত্ত লেখা হওয়া উচিত। ইংল্যান্ডের ইতিবৃত্ত কেউ কেউ নিওলিথিক ও পোলিওলিথিক অধিবাসীদের দিয়ে শুরু করেছেন। তারও আদিমকালের অতীতে যেতে হলে, ভূতত্ত্বের কথা আসে। ওয়েলস্ তাঁর ইতিবৃত্ত সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন। অনেকটা পুরাণের মতোই। কিন্তু হিসাবের কালবিন্দু যীশু জন্মকাল। পুরাণের কি কোনো কালবিন্দু নেই? নেই। তার আদিবিন্দু আছে, তাকে বলা হয়েছে মানবকল্পের আদিবিন্দু। স্বয়ম্ভুর মনুকাল, পাঁচ হাজার নশো আটান্ন খৃষ্টপূর্বাব্দ। এই আদিবিন্দুর অতীতে আর কিছু নেই। থাকলেও তা ইতিবৃত্তে আসেনি।

মুশকিল! বলে তো যাচ্ছি ইতিবৃত্ত। বিষয়টা কী? পণ্ডিত বলছেন, ইতিবৃত্ত শব্দের অভিধা ইতিহাস শব্দের অনুরূপ হওয়ায়, তা হিস্টরি অর্থে অচল। হিস্টরির সংস্কৃত অর্থ ইতিবৃত্ত। ইতিহাস শব্দের অর্থ, সংস্কৃতে আর বাঙলায় ভিন্ন। পুরাণের বিচারে ভুলের সম্ভাবনায় ভরা। ইত অর্থে যা গত হয়েছে, বৃত্ত অর্থে বর্ণনা। ইতবৃত্ত, এই পারিভাষিক প্রয়োগে ভুলের সম্ভাবনা নেই।

দ্বারাবতী ভ্রমণে যাবার দেখছি বিস্তর ঝকমারি। পথঘাটের নিশানা পাওয়া ভারি দুষ্কর। পথ চিনে যাওয়ার হাজার হাজার বছরের কাঁটা। কাঁটা না, কালের স্তর। অথচ ঠিক ঠিক পথে যাচ্ছি কি না, সে-সংশয়ে হোঁচট খাচ্ছি বারে বারে। কিন্তু সংশয় না ঘুচিয়ে উপায় নেই। দিঙ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে অতএব পথ বন্ধন করো। যার নাম যুক্তিতে হদিস।

আমি নৈয়ায়িক না, ন্যায়শাস্ত্রের কূট চালেও নেই। পুরাণের ইতিবৃত্তের পথই আমাকে খুঁজে নিয়ে যেতে হবে। পুরাণকারের কথা আগেই বলেছি, তাঁদের ইতিবৃত্তের লক্ষণ বা উপাদান সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত। সর্গ বোঝায় বিশ্বের সৃষ্টি, প্রতিসর্গ প্রলয়। রাজা ঋষি প্রধান ব্যক্তিগণ দেবতা দৈত্য-গণের বংশের উৎপত্তি স্থিতি বিলোপ আর বংশানুক্রম। বংশ শব্দের অর্থ ইংরেজিতে কি ডাইনাস্টি? হ্যাঁ একেবারে সম্যক বংশ বর্ণনা। মন্বন্তর এখানে 'দুটো ভাত দাও মা' দুর্ভিক্ষের অর্থে না। মন্বন্তর মনুকাল। কাল গণনার জন্যই যুগকাল আর মনুকাল পুরাণকারেরা ধরে নিয়েছেন।

এই ইতিবৃত্তকারগণ কারা? দেখছি, পুরাকালে প্রত্যেক রাজার নিজের ইতিবৃত্তকার থাকতেন। এঁদের বলা হতো মাগধ। এঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ সংগ্রহ করতেন সূতগণ। এই সূতেরাই হলেন খাঁটি লোক, কোনো বিশেষ বংশের পোঁ ধরা ছিলেন না। মিথ্যাকে কাট-ছাঁট করতে জানতেন। তাঁদের বিবরণ পুরাণের মূল ভিত্তি। তাঁরা এক একজন ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার। সূত ঋষিগণকে বলছেন, আপনাদের দ্বারা পুরাণ কথনে প্রণোদিত হয়ে আমি নিজেকে পবিত্র আর অনুগৃহীত বোধ করছি। আমার স্বধর্ম, দেবতা আর ঋষিগণের, অমিততেজসম্পন্ন রাজাদের, খ্যাতনামা মহাত্মাদের বংশবৃত্তান্ত

জানা এবং ধারণ করে রাখা। কিন্তু বেদে আমার কোনো অধিকার নেই। অথচ পুরাণ বেদসম্মিতম্।

বেদের আগে পুরাণ। আমি আদি পুরাণে যা শুনেছি, মহাত্মা ঋষিগণ যা বলেছেন, পরাশরপুত্র গুরু দ্বৈপায়ন অতি কষ্টে যা নির্ণয় করে গিয়েছেন, ঠিক যেমনটি শুনেছি, তেমনটি আপনাদের শোনাই। আমাকে (আমাদের) বলা হয়েছে, অতিশয় বিশ্বাসভাজন বিদ্বান লোমহর্ষণ সূত। আমি যে-কথা যেমনভাবে শুনেছি ঠিক সেইভাবেই বলি। আমার স্বধর্মের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য সত্যব্রত-পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা। আমি নির্ভীক, ক্ষমতাবানদের ভয় করি না। রাজনৈতিক কারণে, কোনো নেতা রাজা বা বংশের কাছ থেকে ঘুষ খাই না।

আমি সাধারণের উপযোগী আর লোকহিতার্থে, ভাষাকে যথাসম্ভব সরল করি।

আহা, বুঝেছি হে। পুরাণের অতিরঞ্জন আর অত্যুক্তির কথা বলবে তো? ভ্রূকুটি সন্দেহ দেখেই তা বুঝতে পেরেছি। দেখ, পক্ষপাতবশে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে 'ইতিহাস' লেখকগণ যে-সব অতিরঞ্জন কথা বলেন, এঁদের বলার গুণে মিথ্যা সহজে ধরা পড়ে না। আমাদের অতিরঞ্জন একেবারে জ্বলজ্বল করে, ধরিয়ে দিতে হয় না। সেইজন্যই এত সন্দেহ। কিন্তু আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো মানবে তো? আমাকে তুমি চসার সাহেব বলে ধরে নিলে সব গোলে হরিবোল্ হয়ে যাবে। ধরো, আমি বললাম, রাম পনরো বছর বয়সে সীতাকে বিয়ে করলেন, সাতাশ বছর বয়সে বনে গেলেন, বিয়াল্লিশ বছর বয়সে অযোধ্যায় ফিরে রাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। তারপর? তারপরেই বললাম, রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করে স্বর্গারোহণ করলেন।

তোমার যতো সন্দেহ আর অবিশ্বাস, এই শেষের কথায়, কেমন না কি? বিয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। তারপরেই একেবারে এগারো হাজার বছর! কেন, তোমরা কি কীর্তিমানকে আশীর্বাদ বা গৌরব করে বলো না, 'হাজার বছর পরমায়ু হোক!' পশ্চিমের লঙ্ লিভ-কে তোমরা তোমাদের প্রিয়জন অমুক গান্ধী আর তমুক বসুকে, খুশির উত্তেজনায় বলো, যুগ যুগ জীও। ভালোই জানো হাজার বছরের পরমায়ু নিয়ে কেউ জন্মায় না, যুগ যুগ জীইয়েও কারোকে রাখা যায় না। তবু তো বলা। আর বলাটা শিখিয়েছি আমরাই। মহত্ত্ব বীরত্ব সুকৃতি অতুলনীয় কীর্তির গৌরব করতে হলে, আমরা এমনই অতিশয়োক্তি করি। তাহলে রামের মতো একজন রাজার এগারো বছরের রাজত্বের আশ্চর্য ঘটনা-বহুল কীর্তিকে এগারো হাজার বলতে দোষ কী?

'পুরাণের অতিরঞ্জনের এটি একটি চাবিকাঠি বলে জানবে। এই 'হাজার' হলো উপলক্ষণ প্রয়োগ। যেমন আরো দু-একজনের কথা বলি। কার্তবীর্যার্জুন পঁচাশি হাজার বছর বেঁচেছিলেন। অলর্ক ছেষট্টি হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন। হাজারের উপলক্ষণ সরিয়ে দেখবে, কার্তবীর্যার্জুন পঁচাশি বছর বেঁচেছিলেন। অলর্ক ছেষট্টি বছর রাজত্ব করেছিলেন। এও কীর্তিরই গৌরব। যে-দেশে, যাদের যেমন। পৃথিবীর আর কোন দেশে তুমি এমন আশীর্বাদ শুনেছো, হাজার বছর বাঁচো। শত পুত্রের জননী হও।

'আর একটা কথা তোমাদের শোনাই। 'দিবি আরোহণ' বলে একটা কথা আছে। এসব শুনলে, তোমার কুসংস্কার ঘুচবে, সত্যকে জানতে পারবে, পুরাণকে বিস্মিত শ্রদ্ধায় প্রণাম জানাতে শিখবে। এর নাম জ্ঞান। দিবি আরোহণ, মানুষেরই দেবত্ব-লাভের কথা। উত্তম মানুষ প্রতিলোম ক্রিয়ায় দেবতা হন। প্রতিলোম ক্রিয়ার

আশ্চর্য সূত্র হলো, উত্তম মানুষ প্রথমে মানুষ রূপেই পূজিত হন, তারপরে তিনি দেবতা হন, তারপরে তাঁকে জ্যোতিষ্ক রূপে কল্পনা করা হয়।

'যেমন ইন্দ্র একাধিক এবং সকল ইন্দ্রই প্রথমে মানুষ ছিলেন, পরে দেবতা তারপরে সূর্য। দিবি আরোহণের এই সূত্র না মানলে ঋক্‌বেদের ইন্দ্র বিষয়ক সমস্ত সূক্তগুলোর সরল অর্থ পাওয়া যাবে না। মানুষ দেবতা আর সূর্য এই তিনরকমেই ইন্দ্রের কীর্তিকলাপ ঋক্‌বেদে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ মানুষ, কৃষ্ণ নারায়ণ, কৃষ্ণ সূর্য। ধ্রুব মানুষ, ধ্রুবই আবার জ্যোতিষ্ক। সূক্তগুলোকে যিনি জ্ঞান আর বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্মভাবে পাঠ করেন, তিনিই দেবতার মনুষ্যত্ব নির্ণয় করতে সক্ষম।

'তোমার যাত্রা দ্বারাবতী। তোমাকে আমি কয়েক হাজার শ্লোক শোনাবো না। দেবতা কারা, স্বর্গ কোথায়, এই পথ বন্ধন করে নিতে পারলে তোমার যাত্রা যথার্থ হবে। আগে দেবতার পরিচয় হোক। আমি প্রাকৃতিক শক্তির অভিমানিনী দেবতার কথা বলেছি। এখন যে-দেবতার কথা বলছি, তাঁরাই দেব দৈত্য ইত্যাদি নামে পরিচিত। তোমরা এখন সকল জাতিকেই মানুষ বলো। আমি মনুবংশীয়দের প্রতি একমাত্র মানুষ শব্দ প্রয়োগ করেছি। অন্যান্য জাতি হলেন, দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, সর্প নাগ সিদ্ধ যক্ষ রক্ষ ইত্যাদি। অসুরেরা ছিলেন দেবতাদের জ্ঞাতি ও বন্ধু। 'সিসৃক্ষোর্জ্ঘানাৎ পূর্বমসুরা জজ্ঞিরে ততঃ, ততঃ পুরা।' স্বয়ম্ভুব মনুর আদি-বিন্দু থেকে আমরা ব্রহ্মাকেই সৃষ্টিকর্তা বলে জেনেছি। তিনি প্রথমে অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন, শ্লোকটা তাই শোনালাম। তারপরে দেবতা, পরে পরে পিতৃগণ, মানুষ, যক্ষ রক্ষ সর্প গন্ধর্ব। ঋক্‌বেদে কোনো কোনো জায়গায় ইন্দ্রকে অসুর বলা হয়েছে। অনেকটা, তোমরা যখন কারোকে বলো, লোকটা অসুর সেইরকম ভাবে। অসুরেরা ছিলেন অতি শক্তিশালী জাতি। দেবতাদের কোনো কোনো জ্ঞাতিবর্গ পরবর্তীকালে নিজেদের অসুর বলেই পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। কিন্তু দেবতাদের দায়াদ বন্ধু বললেও অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের ইন্দ্রত্ব নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ প্রায়ই লেগে থাকতো।

'আমি কী বলি জানো? পুরাণের সাহায্য ছাড়া বেদের অর্থ কখনো সুগম হয় না। আমি সূত, আমি যদ্দৃষ্টং বর্ণনা করি, যথাশ্রুতি বলি, ঋষি লেখেন। আমি বলি, যে পুরাণ জানে না, বেদ তার কাছে প্রহৃত হবার আশংকা করেন।

'আমি তোমাকে একজন ইন্দ্রের কাহিনী বলবো। বিভিন্ন ইন্দ্রের কীর্তি এঁর ওঁর ঘাড়ে চেপে অনেক সময়েই গোল বাঁধিয়েছে। আমি যাঁর কথা বলছি এঁকে বলা হতো, বৃত্রহন্তা বজ্রধারী, পুরন্দর ইন্দ্র। বিরাট যোদ্ধা ছিলেন। পুরন্দর অর্থে যিনি পুরী ধ্বংসকারী। অসুরদের অনেক নগর ইনি ধ্বংস করেছিলেন।

'ঝটিতি তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তোমাদের কালে কোনো কোনো পণ্ডিত মহেন-জ-দরো সভ্যতাকে প্রাক্ আর্য দ্রাবিড় সভ্যতা বলে দাবী করেছেন। না জেনে করেছেন, আসলে ভিত্তিহীন অনুমান এবং আন্দাজ। অনুমানে প্রমাণ-সিদ্ধি হয় না। মহেন-জ-দরো আবিষ্কার পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো। তখন স্বর্গ এবং ইন্দ্রদের ইতিবৃত্ত আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। আরো বলে রাখি, দেবতারা মানুষ ছিলেন। কথাটা আগেও বলেছি। পুরন্দর ইন্দ্রও একজন বীর মানব। জাতিতে দেবতা।

'তোমাদের একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত, ঋকবেদসংহিতার অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত, মানুষ ইন্দ্রের দেবত্ব বিষয়ে অনেকগুলো ঋকের অনুবাদ করেছেন। আমি

কয়েকটি তোমার সামনে তুলে ধরছি :

'হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, ত্বরান্বিত হয়ে স্তোত্র গ্রহণ করতে এস। এই সোম অভিষবযুক্ত যজ্ঞে আমাদের অন্ন ধারণ কর।'

'হে সোমপায়ী ইন্দ্র, আমাদের অভিষবের নিকট এস, সোম পান কর। তুমি ধনবান, তুমি হৃষ্ট হলে গাভী দান কর।'

'হে শতক্রতু, এই সোম পান করে তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদের বিনাশ করেছিলে। যুদ্ধে (তোমার ভক্ত) যোদ্ধাদের রক্ষা করেছিলে।'

'হে ইন্দ্র, দৃঢ় স্থাপনে ভেদকারী এবং বহনশীল খরত্বদের সঙ্গে তুমি গুহায় লুকিয়ে রাখা গাভী সমূদয় খুঁজে উদ্ধার করেছিলে।'

'যুবা মেধাবী প্রভূতবলসম্পন্ন সকল কর্মের ধর্তা বজ্রযুক্ত বহুস্তুতিভাজন ইন্দ্র (অসুরদের) নগরবিদারকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।'

'বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কাজ করেছিলেন, তাঁর সেই সব কাজের বর্ণনা করি। তিনি অহিকে (মেঘকে) হনন করেছিলেন, পরে বৃষ্টিবর্ষণ করেছিলেন, বহনশীল পার্বতীয় নদীসমূহের (পথ) ভেদ করে দিয়েছিলেন।'

'সব সূক্তগুলো শোনাতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। দ্বারাবতী যাত্রার জন্য তুমি অতি ব্যস্ত হয়েছ। এবার আমি আর কয়েকটি সূক্ত শোনাবো, তারপরে ব্যাখ্যা করব, এসব সূক্তের অর্থগুলো। এবার শোনো, ইন্দ্রও নিজের বজ্র নিজে হেনে, কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।'

'হে ইন্দ্র, অহিকে হনন করার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, তখন তুমি অহির কোন হন্তার জন্য অপেক্ষা করছিলে, যে ভয় পেয়ে শ্যেন পাখির মতো নবনবতি নদী ও জল পার হয়ে গিয়েছিল।'

'তুমি শুষ্ণ (অসুরের) সঙ্গে যুদ্ধে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করেছিলে, তুমি অতিথিবৎসল (দিবোদাসের রক্ষার্থে) শম্বর (নামক অসুরকে) হনন করেছিলে। তুমি মহান অর্বুদ (নামক অসুরকে) পদদ্বারা আক্রমণ করেছিলে, অতএব তুমি দস্যুহত্যার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছ।'

'ত্বষ্টা তোমার যোগ্য বল বৃদ্ধি করেছেন, এবং তাঁর পরাভবকারী বল দ্বারা বজ্র তীক্ষ্ণ করেছেন।'

'ইন্দ্র পৃথিবীর ওপরে স্থাপিত মধুর উদকপূর্ণ যে-চারটি নদী জলপূর্ণ করেছেন, তা সেই দর্শনীয় ইন্দ্রের অতিশয় পূজ্য ও সুন্দর কর্ম।'

'তিনি বৃত্রকে বধ করে তন্নিরুদ্ধ বারি নির্গত করেছিলেন।'

'তিনি সুদর্শন, সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও হরি নামক অশ্বযুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হাতে লৌহময় বজ্র স্থাপন করলেন।'

'অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচির (মূলে ঋষি নামের উল্লেখ নেই) অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতিবার বধ করেছিলেন।'

'নদীসমূহ যাঁর নিয়মানুসারে বহে যায়।'

'যিনি মহতি সেনার নায়ক তিনিই ইন্দ্র।'

'তিনি বজ্রের দ্বারা নদীর নির্গমদ্বার সকল খুলে দিয়েছিলেন।'

'ইন্দ্র নিজ মহিমায় সিন্ধুকে উত্তরবাহিনী করেছেন।'

'তুমি বন্ধ সিন্ধুগণকে উন্মুক্ত করেছ।'

'আমি সুত, পুরাণকারের একমাত্র বাহন। আমি বলি, এই যে আশ্চর্য বলবীর্যশালী পুরুষ, স্বাভাবিক দিবি আরোহণের ফলে, ইনিই আন্তরীক্ষ দেবতা কল্পিত হন। যেমন তাঁদের অনেকের পরে রাম বা কৃষ্ণ ভগবান হয়েছিলেন। যেমন পরে তোমরা দেখেছ, নবদ্বীপের নিমাই মিশ্র নিজ মহিমায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়েছিলেন। এখন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভগবান। আমি তো দেখি, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসবের তুলনায় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ সুভাষ বসুর জন্মদিনের উৎসব আয়োজন পূজা কিছুমাত্র কম নয়।

'এখন এই পুরন্দর ইন্দ্রের বিষয় বুঝতে পারলে? তাকে বিশেষভাবে বৃত্র-হন্তা বলা হয়। এই বৃত্রকে বলা হয়, হিরণ্যকশিপুর কন্যা রমা ও মহর্ষি ত্বষ্টার ছেলে। আমি জানি, ত্বষ্টা নামে একাধিক গুণী ব্যক্তি ছিলেন। যদিও ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে, ত্বষ্টাপুত্র বৃত্রকে ইন্দ্র নিহত করেছিলেন। কিন্তু তার আগে বৃত্র তদানীন্তন ইন্দ্রকে আঠারোবার পরাজিত করেছিলেন। স্বর্গের সম্রাটদের 'ইন্দ্র' বলা হয়, অতএব তাঁর কাছে এই পরাজয় ছিল অত্যন্ত অসম্মানজনক ও হৃদয়-বিদারক।

'আমার মনে হয়, পুরন্দর ইন্দ্রের বিশেষ কীর্তিসমূহ শোনাবার আগে তোমাকে স্বর্গের অবস্থানটা জানানো দরকার। আমি সুত, স্বর্গের ঠিকানা আমার জানা আছে। ভারতের উত্তরে হিমালয়। হিমালয়ের উত্তরে হেমকূট, তার দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ। হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। হরিবর্ষের উত্তর সীমা নিষধ পর্বত। নিষধের উত্তরে "ইলাবৃতবর্ষ"। ইলাবৃতের উত্তরসীমা নীলাচল।

'এই ইলাবৃতবর্ষ, তোমাদের এখনকার মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত। আধুনিক পামির পূর্বতুর্কীস্থান ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত। এই ইলাবৃতবর্ষেরই অপর নাম "স্বর্গ"। তোমাদের কে একজন কবি যেন লিখেছেন, "কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহু দূর/মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতেই সুরাসুর।" আসলে এই কবিও স্বর্গ নরকের একটা কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু ভৌম স্বর্গের ভৌগোলিক অবস্থান জানতেন না।

'পুরাকালে এই ইলাবৃতবর্ষ অতি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। পরে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে, নদনদী শুকিয়ে তথাকার সভ্যতা লুপ্ত হয়। আরো একটা কারণ, আমি অনেকবার বলেছি, তেত্রিশ কোটি দেবতা। তার মানেই, স্বর্গ অত্যন্ত জনাকীর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। অতএব ভারতবর্ষে আগমন।

'আমি জানি যেখানে বলি যজ্ঞ করেছিলেন, সেই সুবিস্তৃত প্রদেশের নাম ইলাবৃতবর্ষ। এই স্থান দেবগণের জন্মস্থান। তাঁদের বিবাহ, যজ্ঞ, জাতকর্ম, কন্যা-দান প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ এই প্রদেশেই অনুষ্ঠিত হয়। দেবগণ আধুনিক তুর্কীস্থান থেকে কাশ্মীরের পথে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব থেকে বিন্ধ্যাচলের উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত অধিকার করেন। তারপরে বিন্ধ্যের দক্ষিণেও অগ্রসর হন। বলতে গেলে, আস্তে আস্তে তাঁরা সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আমি এইভাবে ভাগ করি, ইলাবৃতবর্ষ কাশ্মীর বিন্ধ্যোত্তর ভারত এবং দক্ষিণাপথ পর্যায়ক্রমে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত্য, পাতাল নামে পরিচিত। ভারতীয়দের পূর্বপুরুষেরা প্রথমে কাশ্মীর বা অন্তরীক্ষে এসে বাস করেন তাই তার অপর নাম পিতৃলোক।

'দেবগণ যখন প্রথমে ভারতে এলেন, তখন তাঁরা ইন্দ্রের অধীন ছিলেন। ভারতে তখন কেউ রাজা ছিলেন না। দেবগণ ভারতে এসে মানব জাতি হলেন, কারণ ইন্দ্রের প্রতিভূর নাম হলো মনু বা প্রজাপতি। পরে ভারতে রাজা হয়ে, বেণরাজা প্রথম ইন্দ্রের বশ্যতা অস্বীকার করেন। ইলাবৃতবর্ষই যেহেতু আদি বাসস্থান, অতএব পবিত্র তীর্থভূমি বিবেচিত। যুধিষ্ঠিরের সময়েও স্বর্গে

যাত্রার প্রচলন ছিল। স্বর্গের পথ ক্রমেই দুর্গম হয়ে পড়ে। আর দিবি আরোহণের ফলে, স্বর্গ মৃত পুণ্যাত্মাদের বাসস্থান কল্পিত হয়েছে, দেবযান পরিণত হয়েছে নক্ষত্রবীথিতে। এখন স্বর্গপ্রাপ্তি মৃত্যুর নামান্তর। আমি মৎস্যপুরাণে একজন ইন্দ্রকে "হীনচেতা" বলেছি, কারণ সে সামরিক কারণে, যখন থেকে বজ্র দ্বারা স্বর্গপথ রোধ করেন, তখন থেকে লোক সকলের স্বর্গমার্গ নিবারিত হয়। তার মানে পাহাড় ধ্বসিয়ে পথরোধ করা হয়। এই পথ ছিল মধ্য এশিয়া আর ভারতে যাতায়াতের বণিকপথ। কিন্তু স্বর্গ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অমর, অতএব দেবযান পথ বন্ধ হয়ে গেলেও বদরীনারায়ণ আর মানস সরোবরের পথে অনেকে স্বর্গে যেতো। যুধিষ্ঠিরকে এই পথেই যেতে হয়েছিল। এই সেই কৈলাসপতি রুদ্র—অর্থাৎ শিবের রাজত্ব। তিব্বতে চিরকালই ভূত প্রেতের নাচ প্রসিদ্ধ। এরা শিবের অনুচর। ইন্দ্রের অনেক পরে শিবও ঋষিদের যজ্ঞভাগী হন।

'মনে রেখো স্বর্গেরও উত্তর কুরুতে ছিল ব্রহ্মলোক আর বিষ্ণুলোক। আর ভারতীয়দের মতোই, স্বর্গের দেবতাদের আকাঙ্ক্ষণীয় তীর্থ ছিল ব্রহ্ম ও বিষ্ণু-লোক। দেবতারা নিজেদের সেই লোকেরই অধীন মনে করতেন। এখন তুমি এই দুই লোকের সন্ধানে কাসপিয়ান সাগরের কূলে কিংবা সাইবেরিয়ায় যেতে পারো, সন্ধান মিললেও মিলতে পারে। স্বর্গের নেতা অধিপতি ইন্দ্রগণ বিপদে পড়লে বিষ্ণুর পরামর্শ নিতেন। একাধিক ইন্দ্রের মতো, বিষ্ণু বরুণ মিত্রও একাধিক।

'ভারতের বিন্ধ্যাচলের উত্তর ভাগের নাম পৃথিবী বা মর্ত্য। পৃথু রাজার রাজ্যই পৃথিবী। বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগ পাতাল। পাতালকে আমি ভূবিবর বলেছি, দক্ষিণদেশও বলেছি। পাতালেরও সাত ভাগ আছে। আমি পাতালের সাত ভাগে দেখেছি বহু সুন্দর নদ নদী উপবন আর নগর। নারদ বলেছেন, পাতাল স্বর্গাপেক্ষাও মনোরম।

'দ্বারাবতীর কোন উপাখ্যান তুমি বলবে, জানি না, কিন্তু পাতালের বর্ণনা শুনে রাখো। অতল—ময়পুত্র মহামায়ার রাজত্ব। বিতল—হাটকেশ্বর হর। সুতল—বৈরোচন বলি। তলাতল—ময় ত্রিপুরাধিপতি। মহাতল—সর্পজাতি। রসাতল—দানবজাতি। পাতাল—নাগজাতি। অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গ—সুতল। আমি পাতালের অধস্তন প্রদেশে সংকর্ষাগ্নি দেখেছি। যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরির কথা মনে রেখো। একটা হিসাব দিয়ে রাখি, বলির রাজ্যকাল, তিন হাজার চারশো সাতান্ন খৃষ্ট-পূর্বাব্দ। কপিল পাতালবাসী ছিলেন।

'পুরাণের ইতিবৃত্ত প্রমাণের একটি আশ্চর্য ঘটনা এখানে শোনাই। সগরের বংশধর ছেলে অসমঞ্জ এবং আরো ষাট হাজার ছেলে পাতালে কপিল শাপে বিনষ্ট হয়, এ আমারই কথা। ষাট হাজার অশ্ববাহিনীকে আমি যজ্ঞীয় অশ্ব বলি। সগর অশ্বচোরের সন্ধানে যাদের পাঠালেন, তারা ঘোড়ার খুরের চিহ্ন দেখে দেখে, কপিলের কাছে উপস্থিত হয়ে, তাকেই চোর ভেবে ধরতে গিয়ে, কপিলের অগ্নিপিঙ্গল বর্ণের দিকে তাকিয়েই অভিশপ্ত হয়ে মারা গেল। তখন সগর পৌত্র অংশুমানকে অশ্বের সন্ধানে পাঠালেন। অংশুমান সাবধানী, তিনি কপিলকে খুশি করে যজ্ঞীয় অশ্বসকল নিয়ে পিতামহকে ফিরিয়ে দিলেন। অংশুমানের ছেলের নাম দিলীপ। দিলীপের ছেলের নাম ভগীরথ।

'জানো তো ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন। আসলে, তোমাদের ভঙ্গীতে বললে, বলতে হয়, ভগীরথ একজন ইরিগেশনের বীর এঞ্জিনীয়র যিনি গঙ্গাকে খাল কেটে সুদীর্ঘ পথে সাগরে মিশিয়েছিলেন। সগর বংশের এইটি একটি মহান

কীর্তি। সগর খাল কাটিয়ে গঙ্গাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য প্রথমে বংশধর পুত্র অসমঞ্জ এবং আরো ষাট হাজার অশ্বারোহী পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন। লক্ষ্য রেখো, অসমঞ্জ 'বংশধর পুত্র', বাকীরা কেবলই 'পুত্র'। এটাই আমাদের—সূতদের বৈশিষ্ট্য। ষাট হাজার খননকারী কর্মীকেও আমরা সগর পুত্র বলে উল্লেখ করলাম, কিন্তু বংশধর পুত্র বললাম না।

'তা হলে দেখা যাচ্ছে, অসমঞ্জ, তারপরে অংশুমান। তারও পরে অংশুমানের পৌত্র ভগীরথ আবার সেই খাল খননের কাজে লাগলেন। কিন্তু কে কপিল। কিসে এত বিস্তর লোক মারা গেল?

'কৃষ্ণ একবার বলরাম আর প্রদ্যুম্নকে সঙ্গে করে বাণরাজ্য থেকে অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করতে গিয়ে মাহেশ্বর জ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। বাণরাজ্য আধুনিক আসাম। মাহেশ্বর জ্বর শুনলেই ব্যাধির নাম মনে আসে আর সেই ব্যাধি অতি ভয়াবহ দৈত্যের থেকেও ভয়ঙ্কর।

'বাঙালীরা দক্ষিণের ম্যালেরিয়ার কথা কখনো ভুলবে না। যকৃতের দোষ, চোখ হলদে আর বিভীষিকাময় জ্বর। পিঙ্গলবর্ণ কপিলের ইঙ্গিত সেখানেই। ঘোড়া-গুলো চরে বেড়াচ্ছিল, ষাট হাজার খননকারী মরে পড়েছিল। অতএব কপিলকে সাধনা করেই সাধ্যায়ত্ত করতে হয়। অসমঞ্জ থেকে ভগীরথ তিন পর্যায়কাল ব্যবধান—আমার হিসাবে পঁচাশি বছর সময় লেগেছিল। তাই আমি গঙ্গাকে একটি নতুন নাম দিলাম ভাগীরথী। সগরের নামানুসারে, সমুদ্রকে সাগর। এই বিশাল আর পুণ্য কর্মের জন্য গঙ্গাসাগর বিন্দুকে তীর্থ বোধ করলাম, আনন্দে অবগাহন করলাম। কিন্তু কপিলের স্থান তাই দুরন্ত শীতে পৌষ সংক্রান্তির দিন ধার্য। অন্য কোনো ঋতুতে নয়, কপিল ক্ষুব্ধ হতে পারেন।

'মনে রেখো, এই কপিল, সাংখ্যকার কপিল মুনি নন। ব্রহ্মা তাঁকে জন্মাতে দেখেছিলেন সৃষ্টির আদিতে। ইনি মানুষ নন। সৃষ্টির আদিতে যে হিরণ্ময় অণ্ড জন্মেছিলেন আমরা তাঁকে তারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলেছি। এক এক অস্বাস্থ্যকর সংক্রামক রোগের স্থানে, সগর সন্তানদের মতো অনেক মৃত্যুর খবর তোমরাও জানো। মীরজুমলার দুই লক্ষেরও বেশি সৈন্য আসামে গিয়ে জ্বরে মারা গিয়েছিল।

'আমি জানি, পুরাকালে অনেক ব্যক্তি খাল খনন পূর্তাদি কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জানি, গঙ্গাকে খনিত খাল ভাবতে তোমার বিশ্বাসে আঘাত লাগছে। কিন্তু মানুষের কীর্তিই পুণ্য, তাঁর দিবি আরোহণ সেখানেই। এই বিশাল কর্মকে প্রণাম করি, পুণ্যাবগাহন করি।

'তোমার দ্বারাবতী যাত্রা আর সবুর সইছে না। অথচ এসব না জেনে, যাত্রাটাও ঠিক হবে না। আসলে তোমার বাইরে ত্বরা, অন্তরে তুমি তন্ময়। এবার তোমাকে পুরন্দর ইন্দ্রের কয়েকটি কথা বলি। বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্র যুদ্ধে বারবার পরাজিত হয়ে খুবই অশান্তি বোধ করেছিলেন। বৃত্র যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। তিনি ইন্দ্র আর তাঁর প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করার জন্য, পাহাড় ধ্বসিয়ে চারটি নদীপথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র বৃত্রকে হনন করে বজ্রাঘাতে পর্বতকে বিদীর্ণ করে রুদ্ধ নদীপথ খুলে দিয়েছিলেন। তাই তিনি পর্জন্যদেব, জলমোচনকারী। সূক্তগুলোর কথা মনে করো।

'কিন্তু মানুষ কেমন করে বজ্রকে ধারণ করবেন? না, প্রাকৃতিক বজ্রকে কেউ ধারণ করতে পারেন না। তথাপি আমি দেখছি, বজ্র ইন্দ্রের আয়ুধ। এই বজ্র

তোমাদের বন্দুকের মতোই এক অস্ত্র ছিল। এই বজ্র সুদূরপাতী। এই অস্ত্রটির জন্য ইন্দ্র হতাশ হয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়েছিলেন। বিষ্ণু বললেন, 'এই বৃত্র অস্থিময় বজ্রের দ্বারা নিহত হবে।' ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন জীবের অস্থি দিয়ে এই বজ্র তৈরি হবে? গজ, শরভ বা অন্য কোন জন্তুর অস্থি আবশ্যক আমাকে তা বলুন।'

বিষ্ণু বললেন, 'সুরাধিপ, সেই জীব শত হস্ত প্রমাণ, মধ্যে ক্ষীণ দুই পার্শ্বে স্থূল ছয় কোণ অর্থাৎ পলযুক্ত ভীষণাকৃতি হওয়া চাই।' ইন্দ্র হতাশ হয়ে বললেন, 'আমার পরিচিত ত্রৈলোক্য মধ্যে এমন কোনো প্রাণীই যে দেখি না।'

'আমি তোমাকে এখন আর রূপকের কথা বলবো না। সরাসরি বলবো। বিষ্ণু বললেন, 'সরস্বতী তীরে যে বিশাল দধীচি আছেন তিনি এর বিপরীত। ইন্দ্র সরস্বতী তীরে গিয়ে দধীচির দেখা পেলেন। আমি অবিশ্যি এখানে দধীচিকে বিপ্র বলেছি, এটাই আমার বৈশিষ্ট্য। ইন্দ্র গিয়ে তাঁকে বললেন, 'হে বিপ্র, আপনি ভিন্ন এত বিশাল প্রাণী আর দেখি না।' অতএব ইন্দ্র দধীচির অস্থি গ্রহণ করলেন। তাঁর করোটি অশ্বমস্তকের ন্যায় দেখতে ছিল। অস্থির অন্য অংশ না মস্তকটি চাই, আর তার জন্য ইন্দ্রকে, পাহাড়ে লুকানো শরণাবতে সরোবরে তা খুঁজে পেতে হয়েছিল।

'তোমার চোখের সামনে কি প্রাচীন প্রাণী ডাইনোসোরাসের ঘেটেক জাতীয় করোটি ভেসে উঠছে? উঠলেও আমি কোনো মন্তব্য করবো না। কিন্তু অস্থি পেলেই তো হবে না। বারুদ চাই, নির্মাণ করা চাই সেই ভয়ঙ্কর আয়ুধ। তখন ইন্দ্র গেলেন আর একজন ত্বষ্টা নামক জ্ঞানীর কাছে। ইনি বৃত্রের পিতা ত্বষ্টা নন। এই ত্বষ্টার বারুদ বিষয়ে জ্ঞান ছিল। আর বারুদ তৈরি করতে জানতেন, ইলাবৃতবর্ষের সংলগ্ন ভদ্রাশ্ববর্ষে, তোমরা এখন যাকে চীন বল, সেই দেশের বিশিষ্ট গুণধরগণ।

'তোমাদের আধুনিক ভূবিজ্ঞানীরা, পূর্বতুর্কীস্থান আর তার নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে, প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কাল, কিছুকাল আগেও আবিষ্কার করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক কাল বলতে, আমি সর্বদাই স্বয়ম্ভু মনুকালের পূর্বের কথা বলি। বিলিতি বি-সি এ-ডি ইত্যাদির কথা বলি না। যে-প্রাণীর দ্বারা দেব ও মানবজাতির ইষ্ট হয়, আমরা সেই প্রাণীকেও ঋষিতুল্য জ্ঞান করি। আধুনিক-কালের ইতিহাস লেখকগণের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূলত তফাত এইখানে।

'যাই হোক, বজ্রায়ুধ সৃষ্টিকারী ত্বষ্টা ভদ্রাশ্ববর্ষ থেকেই বারুদ তৈরি করতে শিখেছিলেন। তিনি দধীচির অশ্ব করোটির ন্যায় সুবিশাল মস্তক দিয়ে যে বজ্রাস্ত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা ছিল দীর্ঘ নালিক অস্থির সঙ্গে যুক্ত। বারুদ ধাতুখণ্ড প্রস্তরাদি ঠাসা সেই বিশাল অস্ত্রের বর্ণনায় বেদ বলেছেন, বজ্রটি প্রকাণ্ড, শতপর্ব, চারপলযুক্ত।

'তোমার নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল হচ্ছে, বৃত্র কোন্ কোন্ নদীপথ, কোথায় অবরোধ করে, ইন্দ্রকে এবং তেত্রিশ কোটি দেবতাগণকে কষ্ট দিচ্ছিল? স্বাভাবিক। আমি সে কথাও বলেছি। মানস সরোবরের কাছে বৃত্র দুটি নদীপথ অবরুদ্ধ করেছিল। বিপাশা আর শতুদ্রী। আমি নদীদ্বয়ের মুখ দিয়েই বলিয়েছি, 'নদী-গণের পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন করে বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদের খনন করেছেন। জগৎপ্রেরক, সুহস্ত, দ্যুতিমান ইন্দ্র আমাদের প্রেরণ করেছেন, তাঁর আজ্ঞায় আমরা প্রভূত হয়ে গমন করছি।' এই নদী দুটির তোমরা আধুনিক নাম দিয়েছ, বিয়াস আর সটলেজ।

'অবিশ্যি পরবর্তীকালে অর্বাচীন সুতগণের দ্বারা এই দুটি নদীই চারটি হয়েছে, তারপরে সাতটি। এ সবই গৌরবে বহুবচন। অর্বাচীনেরা চিরকালই ছিল, এখনো আছে, আর জ্ঞানী তার ভিতর থেকেই সত্যকে অনুসন্ধান করে আত্মসাৎ করেন।

'এইবার সেই সূক্ত মনে কর, যখন বজ্রবাহু সেই বজ্র বৃত্রের প্রতি নিক্ষেপ করলেন, তার শব্দ এমনই বিশ্বপ্রকম্পিত, আগুন ও ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছিল, পর্বত ধসিয়ে দিয়েছিল, অবরুদ্ধ নদীদ্বয় আকাশের মত উঁচু হয়ে প্রবাহিত হয়ে-ছিল, স্বয়ং ইন্দ্র ভয়ে বহুদূর পালিয়ে গিয়েছিলেন। আমরাও ভেবেছিলাম, স্বর্গ লয় পেতে বসেছে। কিন্তু নদী দুটির প্রবল বহমানতা, বৃত্রের অনুচরগণসহ মৃত্যুর সকলই যখন প্রত্যক্ষ হল, সবাই গিয়ে ইন্দ্রকে খবর দিলেন। এই জন্যই ইন্দ্রকে আমরা বলি, জলমোচনকারী। এই করণেই তাঁর দিবি আরোহণের পরে তিনি জলবর্ষণকারী আন্তরীক্ষ দেব হয়েছেন। বৈদিক দেবতাই হলেন শত্রুবিমর্দক পরাক্রান্ত যোদ্ধা।

'আমরা সকলেই সেই স্বর্গের অধিবাসী, কোনোকালেই সেখানকার দেব-দেবীদের, সেই সুন্দর স্থানের কথা ভুলতে পারি না। তোমাদের এখন যেমন বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বর্ধনা সভা হয়, আমরাও সেইরকম সভা উৎসব করতাম। আমরা তাকে বলতাম যজ্ঞ। সেই যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান করা হতো। তাকেই প্রথম পাদ্য অর্ঘ সোম ও অন্ন নিবেদন করা হতো, এবং সকলেই সেই যজ্ঞে সামিল হয়ে, তাঁর স্তুতি করতাম। এক সময়ে গৎসমদ বলছেন, 'লোকে এখন ইন্দ্রকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।' অতএব জনগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি বলছেন, 'যিনি মহতী সেনার নায়ক তিনিই ইন্দ্র। যিনি অহিকে (বৃত্রকে) বিনাশ করে সপ্তসংখ্যক (দুই) নদী প্রবাহিত করেছিলেন, যিনি গো উদ্ধার করেছিলেন, যিনি শত্রু বিনাশ করেন, যিনি বিশ্ব নির্মাণ করেছেন, তিনিই ইন্দ্র।' এ কথাগুলো থেকে বুঝতে পারবে, ইন্দ্রগণ লুপ্ত হবার পরে তাঁদের নরত্ব কি করে আস্তে আস্তে অদৃশ্য দেবত্বে পরিণত হয়েছে। অতএব আমরা এখনো যজ্ঞভূমিতে তাঁকেই আহ্বান করি, তাঁর উদ্দেশেই সোম ও অর্ঘ নিবেদন করি।

'জানি, তোমার দ্বারাবতী যাত্রার ভূমিকা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলো। কিন্তু তোমার যাত্রা এত দীর্ঘতর, তুলনায় এ ভূমিকাকে দীর্ঘ বলা যাবে না। পুরাণের ইতি-বৃত্তীয় সংকেত ও ইঙ্গিতগুলো পেলে, মানুষ ও তার দিবি আরোহণের ফলে দেবত্বের সংবাদ পেলে।

'তোমার যাত্রার আগে, আর একটু সহজ কথা বলি। পৃথিবীতে সব দেশের, সব জাতির নিজেদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। আন্তর্জাতিকতা সেখানেই মহিমময় যখন সকলের সব বৈশিষ্ট্যগুলো পরস্পরের যোগসূত্রে বিশাল ও বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতীয়দেরও নানান বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনো আছে। আমি একজন সূত হিসাবে দেখলাম, ভারতীয়রা যা প্রাণ ধরে রক্ষা করে, তার সঙ্গে ধর্মের একটা সম্পর্ক থাকে। পুরাণ তাদেরই জাতীয় ইতিবৃত্ত, কিন্তু আমি যদি কেবলমাত্র 'ইতিবৃত্ত' বলি, তা হলে তারা তা রক্ষা করবে না। অতএব আমি বললাম, পুরাণ ধর্মপুস্তক। এই পুস্তক প্রতিদিন পাঠ করা, লিখে দান করা, পাঠ করে অপরকে শোনানোর মতো পুণ্য আর কিছু নেই। সেইজন্যই পুরাণ এখনো বর্তমান আছে।

কিন্তু কালের প্রবাহকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। গৎসমদ ঋষি কতকাল আগেই বলেছিলেন, 'লোকে এখন ইন্দ্রকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।' ভারতীয়রাও সেইরকম বহু বহিরাগতদের শাসনে, শিক্ষায়, প্রলোভনে, আপন জাতীয় ইতিবৃত্তকে ভুলতে বসেছে। হাম্পটিডাম্পটির ড্যাডরা তো পুরাণকে জানেই না, বিশ্বাসও করে না। তোমার এই দ্বারাবতী যাত্রার উদ্যমে আমি হৃষ্ট, কারণ তুমি জাতীয় ইতিবৃত্তেরই একটি অধ্যায় তুলে ধরতে যাচ্ছো। প্রকৃত ইতিবৃত্ত, নর ও দেবের ইঙ্গিত, তোমার দরকার ছিল। এখন তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও সহজগম্য হবে। আমার মনে হয়, পরেও আমাকে তোমার দরকার হবে। ডেকো, আসবো। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

এবার মন চলে যাই ভ্রমণে, বাসুদেবের অঙ্গনে। ঠিকানা কী? দ্বারকানগরী। ইতিবৃত্তে বাসুদেব একজন থাকারই কথা। যিনি যেখানেই গমন করতেন, গমনের আগে তাঁর রীতি ছিল, শঙ্খ নিনাদের দ্বারা জ্ঞাতি বান্ধব আর নগরবাসীদের জানানো। যদুবংশের কয়েক শরিকের মধ্যে যিনি বৃষ্ণি গোষ্ঠীর নেতা বার্ষ্ণেয় সেই বাসুদেব তাঁর যাত্রার ঘোষণা এভাবেই করতেন। তার আগেই তাঁর রথের যিনি সারথি, তিনি দুর্মদ অরি নিধনকারী কৃষ্ণের আয়ুধাগার থেকে, রথে তুলে রাখতেন তাঁর ব্যবহারের বিশেষ অস্ত্র গদা শার্ঙ্গপানি এবং চক্র।

বংশপরম্পরার তালিকা, সে-ভারি জটিল জালের বিষয়। তবু একটা ধরতাই থাকা ভালো। যে-পথে ভ্রমণ করছি, এ-যাত্রায় এ-সবের কিছু কিঞ্চিৎ দরকার। যদুকে পেলে, যদুবংশের একটা হিল্লে হয়। মন খোলসা করে, ব্যক্তিকে নির্ণয় করা যায়। অতএব এবারে খোঁজ করি, যদু কে? যাত্রা পথের ধুলো উড়িয়ে দেখছি, যযাতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর গর্ভে যদু আর তুর্বসুর জন্ম দিয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু আর পুরুকে। এঁদের নিয়ে আপাতত আমার দরকার নেই। দেখছি, ইতিবৃত্তের ধুলোর নীচে লেখা রয়েছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু। তারপরের জটিল বংশমালা দেখে আমার মাথা ভিরমি যাচ্ছে। যাত্রার আগে যদুকে নিয়েই দু-এক কথায় বংশপরিচয় সাঙ্গ করি।

দেখছি, এই যদুরই বংশধরেরা কালে কালে সাত্বত, বৃষ্ণি যাঁদের বলে, অন্ধক, ভোজ নানা শাখায় ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। একে বোধ হয় শরিকানার ভাগাভাগিও বলা যায়। এঁরা নিজেদের মধ্যে বিস্তর ঝগড়া বিবাদ করেছেন। সে-কথা আপাতত থাক। বরং তার চেয়ে বলা ভালো বিভিন্ন শাখার এই যদুবংশ দীর্ঘকাল নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পেরেছিলেন। নিশ্চয়ই আমাদের কালের প্রবাদ কাহিনীর সেইরকম জ্ঞানী বুদ্ধিরা যদুবংশে ছিলেন যাঁরা উপদেশ দিয়েছিলেন, এক গাছি কঞ্চিকে অনায়াসে একজন ভাঙতে পারে; একগুচ্ছ কঞ্চিকে পারে না। অতএব ওহে যাদুগণ এককাট্টা হয়ে থাকো। এ ক্ষেত্রে বয়সে বৃদ্ধ না হয়েও যদুবংশের রাজসিংহাসনে আরোহণ না করেও যিনি সমগ্র গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ সংহত করে রাখতে পেরেছিলেন, তৎকালের লোকেরা তাঁকে বিশেষণ দিয়েছিলেন বৃষ্ণিসিংহ। যিনি আমাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিচিত।

নাম তাঁর বহুতর। ছেলেবেলায় আসন্ন ভোরের বিছানায় শুয়ে মায়ের মুখেই তাঁর শতাধিক নাম উচ্চারিত হতে শুনেছি। ইনি অগাধ কীর্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। পুরনো ঐতিহ্যের কথা কে ভোলে? আমরা ভুলি না। আমি ভুলি না।

ইলাবৃতবর্ষে দেবতা জাতির যে-সব কীর্তিশালী ব্যক্তিরা বীর যোদ্ধা মেধাবী শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁদের যেমন দিবি আরোহণ ঘটতো, রূপান্তরিত হতেন ভগবানে, কৃষ্ণেরও সেই দিবি আরোহণ ঘটেছিল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

কিন্তু তাঁর এই অগাধ কীর্তির একটা পশ্চাদ্‌পট ছিল। সাত্বতদের—অর্থাৎ বৃষ্ণিকুল সম্পর্কে ইতিবৃত্ত দেখছি অতি মুখর। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কীর্তন করছেন, সাত্বতগণকে কেউ পরাজিত করতে সমর্থ না। বৃষ্ণি বংশীয়রা যুদ্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অসাধারণ যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করেন।...এঁদের তুল্য বলবান ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। এঁরা জ্ঞাতিদের অবজ্ঞা করেন না, বৃদ্ধগণের আজ্ঞা পালন করেন।...সত্যবাদী, ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানরত মহাত্মা, প্রচুর বিত্তশালী হয়েও অহংকার করেন না।...বিপদের সময়ে সমর্থ ব্যক্তিদেরও উদ্ধার করে থাকেন। এঁরা দেবপরায়ণ, দাতা...এই সব গুণের জন্যই তাঁদের সঙ্গে কেউ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন না।'

কীর্তিমানদের গুণের কথা এখানেই ইতি করা যেতো। আর একটু যোগ করলে, একটি বিশেষ সংবাদের সঙ্গে আশ্চর্য একটি চিত্রও ভেসে ওঠে চোখের সামনে। শূরসেনদের মথুরাবাসী বলা হয়। জ্ঞানী বৃদ্ধরা বলেছেন, 'এঁরা দীর্ঘদেহী, ক্ষিপ্রকারী আর নৌচালনাপটু। এঁদের সর্বদা যুদ্ধের অগ্রভাগে স্থাপন করবে।'...

আমার চমকটা লাগলো 'নৌচালনাপটু' শব্দটিতে। নৌচালনা? তা হলে মহেন-জ-দরো-র "অনার্য-কীর্তি" যুক্তিগুলো টেকে কেমন করে? না, আমি এসব পণ্ডিত তর্কে নেই। ওতে বিস্তর ফাঁদ পাতা। কে কোথা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবেন, কে জানে। আন্ কথায় কী কাজ? কাজের কাজ করো। তবে তোমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করি, এই নৌচালনাপটু সংবাদটির কথা মনে রেখো। দ্বারাবতী গমনের সময় সংবাদটির গুরুত্ব বোঝা যাবে।

কিন্তু যে-কথা বলতে গিয়ে এত কথার উৎপত্তি, সে-এক ঝকমারি। কারণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অনুমতি দিতে গিয়ে কৃষ্ণের মুখ থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে, বঙ্গ পুণ্ড্র কিরাতদেশের অধিপতি, জরাসন্ধের অনুগত, তার নাম আর আমার নাম এক। কিন্তু সে নিজেকে কেবল বাসুদেব বলেই ক্ষান্ত নেই। যে বিশেষণের দ্বারা তোমরা আমাকে ভূষিত করেছ, সে নিজেকে সেই পুরুষোত্তম বিশেষণে ভূষিত করে থাকে। এমন কি মোহবশত সে আমার চিহ্নসমূহও সর্বদা ধারণ করে থাকে। আসলে ভূমণ্ডলে তার প্রকৃত পরিচয়, মহাবলপরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক।

এই বিষয়টিকেই আমি ঝকমারি বলছিলাম। ঘটনাটা ইতিবৃত্তীয় সত্য। এখন দেখছি, কীর্তিমানদের অনুকরণ করার ইচ্ছা আর অভ্যাসটা নিতান্ত একালের না। রূপোলী পর্দার অমুক কুমারকে আপাদমস্তক নকল করার মতো স্পৃহা হাজার হাজার বছর আগেও ছিল। রকমফেরটা অবিশ্যিই মানতে হবে। আমাদের কালে, রূপোলী পর্দার নায়ক নকলবাজরা নিজেদের সাচ্চা বলে চালাবার চেষ্টা করে না। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সেই রোগটি ছিল, কারণ সে কৃষ্ণের বীরত্ব বুদ্ধি আর কৌশলকে ঈর্ষা করতো। অতএব শঙ্খ গদা চক্র তারও থাকতে হবে। কৃষ্ণের মতো মণিকুণ্ডল তারও চাই। উপরন্তু প্রচার করা চাই, সে নিজেই পুরুষোত্তম বাসুদেব।

ঈর্ষা নামক ইন্দ্রিয়টি একবার মস্তিষ্কে বাঁধে গেলে, তখন রক্তক্ষরণের পালা

শুরু হয়। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সেই অবস্থা হয়েছিল। কারণ সে ছিল প্রাগ-জ্যোতিষপুরের অসুররাজ নরকের বন্ধু। কৃষ্ণের অপরাধ, তিনি সেই দর্পী প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিপতি নরককে হত্যা করেছিলেন। নরকের লালসালয় থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন ষোল হাজার রমণীকে। পুরাণকাররা হিসাবটাকে কেউ কেউ ষোল হাজার একশো বলেছেন। প্রাচীন ইতিবৃত্তে প্রক্ষিপ্ত কিছু থাকাটা আশ্চর্যের না, ইতিপূর্বেই স্বয়ং সূত আমাকে এ কথা শুনিয়েছেন। তবে ষোল হাজারের সঙ্গে একশো জোড়া আর না জোড়াটা, যাহা বাহান্ন তাহা তেপান্নর মতোই মনে হয়। তেমন একটা ইতর বিশেষ নেই। কিন্তু নরকের ভোগগৃহ থেকে মুক্ত ষোল হাজার রমণীকে সহসা ব্রজরমণীদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলাটা ঠিক হবে না। ওখানে হিসাবের একটু খটোমটো আছে। বৃষ্ণিসিংহ বাসুদেবের সঙ্গে গোপরমণী রাধার কথায় আমি আদৌ নেই। সেই তো আমার কথা, 'কথা কইতে জানলে হয়, কথা যেল ধারায় বয়।' কৃষ্ণ বলে কথা! বহু ধারায় তাঁর যাতায়াত।

একটা কথা এ সময়েই কবুল করে রাখি। দ্বারাবতী আমার যাত্রা বটে। বাসুদেবেরই সান্নিধ্যে। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে আমার যাত্রা, সেই উদ্দেশ্যের তিনি একটি পার্শ্বচরিত্র মাত্র। কিন্তু তিনিই দ্বারকানগরীর প্রতিষ্ঠাতা স্রষ্টা, তাঁর জীবিতকালের মধ্যে তিনিই প্রধান পুরুষ, সেই জন্য তাঁকে ছেড়ে আমার উদ্দেশ্যকেই প্রতিষ্ঠা করতে পারি না যে। অতএব বাসুদেবায়ঃ শরণং। রাধা অন্য ধারায় আছেন, আমি অন্য ধারায়।

আমি যে-ধারায় চলেছি, সেখানে বাসুদেব শ্রী ও কীর্তিসম্পন্ন অতিমাত্র শত্রু সংহারক, বন্ধুদের ইষ্টাকাঙ্ক্ষী, ঐক্যবন্ধকারী সংগঠক। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের কথা শেষ করি। নরককে কৃষ্ণ হত্যা করেছিলেন বলে পৌণ্ড্রক ক্ষেপে উঠেছিল। বলতে গেলে, তখন থেকেই যদুবংশের যশস্বী বার্ষ্ণেয়কে নিয়ে তার মোহের সঞ্চার, নামের অনুকরণ, আয়ুধ আর চিহ্নসমূহ ধারণের পাগলামি। অথচ রাজাকে যে-সম্মান দেওয়ার রীতি ছিল, সব ক্ষেত্রেই তা তার প্রাপ্য ছিল। আর সেগুলোকে সে কাজে লাগাতো একমাত্র বাসুদেবের বিরুদ্ধাচরণে। কৃষ্ণ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় পাঞ্চালে আসছেন। পৌণ্ড্রকও গেল। ধুলা উড়িয়ে পরতে পরতে লেখা দেখছি, উদ্দেশ্য একমাত্র, কোনো রকমে একটা গোলমাল লাগাতে পারলে কৃষ্ণের সঙ্গে লেগে যাওয়া। কিন্তু দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশী তৃতীয় পাণ্ডব, সব ভেস্তে দিয়েছিলেন। মাঝখান থেকে লাভ, হায়! সেই কৃষ্ণের। জীবনে যাঁদের কখনো চোখে দেখেন নি, অথচ কানাঘুষা শুনেছিলেন, পাণ্ডবেরা জতুগৃহে দগ্ধ হয়ে মারা যান নি, আর মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছিলেন, যেন কোনোরকমে তাঁদের দেখা পান, সেই বৈপ্লবিক মুহূর্তটি এসে গেল দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতেই। পৌণ্ড্রকের জানা উচিত ছিল, 'গোলেমালে গোলেমালে পীরিত করো না।' অর্থাৎ কার্যসিদ্ধি করতে যেও না। কৃষ্ণ গোলমাল থেকে দূরে ছিলেন, আর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়ে দিল।

কিন্তু সে-কথার জালবিস্তার আপাতত না। পৌণ্ড্রক জরাসন্ধের অনুগত হওয়া সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল, উপস্থিত হয়েছিল। ইতিবৃত্তকার ঘটনা লেখেন, সূত বলেন, তুমি তোমার ধারণা মতো ইঙ্গিত ও সংকেতগুলো চিনে নাও। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান অন্তরায় কে ছিলেন? জরাসন্ধ। আর এই জরাসন্ধের প্রবল পরাক্রমের ভয়েই তো স্বয়ং কৃষ্ণের মথুরা ছেড়ে পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে আশ্রয়ের সন্ধান। অতএব জরাসন্ধের

মতো যারা কৃষ্ণ বিদ্বেষী ছিলেন তাঁরাও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আসতে পারেন একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই। কৃষ্ণ বিরোধী প্রচার, কৃষ্ণের নিন্দা, কৃষ্ণকে অবজ্ঞা দেখানো এবং সুযোগ পেলে কৃষ্ণ নিধনেও আপত্তির কোনো কারণ ছিল না।

রাজসূয় যজ্ঞে যাঁরা এসেছিলেন, জরাসন্ধ হত্যাকাহিনী তাঁদের অজানা ছিল না। জরাসন্ধ জীবিত থাকতে, যুধিষ্ঠিরের পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করা কি সম্ভব ছিল? কৃষ্ণের অভিমত, কখনোই না। আগে জরাসন্ধ বধ, তারপরে রাজসূয় যজ্ঞ।

কেন কৃষ্ণ এ পরামর্শ যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন? সূত বলেন, ঋষি লেখেন, তুমি ইঙ্গিত আর সংকেতগুলো চিনে নাও। কেবল শ্রবণ আর পাঠে পুণ্য নেই, পুণ্য অনুভবে। পুণ্য-ভাবনা, আমার কাছে জীবন-জিজ্ঞাসা। মহাবল জরাসন্ধ কৃষ্ণবধে কৃতসংকল্প ছিলেন। এইরূপ প্রচার ছিল, তিনি ছিয়াশিজন রাজাকে কারাগারে বন্দী করেছেন। একশো পূরণের জন্য আর চৌদ্দজন বাকি। যদুবংশে কৃষ্ণ কখনোই রাজসিংহাসনের অধিকারী ছিলেন না। যদুর বংশপরম্পরায় ভোজক শাখার উগ্রসেনই রাজা হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে কংস, তাঁকে বন্দী করে রাজা হয়েছিলেন, আর জরাসন্ধের দুই মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন।

না, বরং বলা যায় জরাসন্ধই যদুবংশকে আপন শক্তির সীমায় রাখার জন্য, কংসের সঙ্গে অস্তি আর প্রাপ্তি নামে দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বুদ্ধিটা কাজে লেগেছিল। জরাসন্ধের মত মহাবল শ্বশুর পেয়ে কংসের মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। তিনি পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে কারারুদ্ধ করে-ছিলেন। আর যদুবংশের রথী মহারথীদেরও পীড়ন করে পায়ের তলায় রেখে-ছিলেন।

উগ্রসেনের ভাই দেবকের মেয়ে দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিয়ে হয়েছিল। বসুদেবের ছেলে, বাসুদেব। তাঁর কংসবধের ঘটনায় আমি যাবো না। যদিও যাবো না যাবো না করে দ্বারাবতীর পথের অলিগলি ঘাঁটতে বিস্তর ধূলোবৃত কাহিনী এসে পড়ছে। বলতে চেয়েছিলাম, জরাসন্ধের বাকি চৌদ্দজন শত্রুর মধ্যে, একজন অন্তত রাজা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুকুটবিহীন সাম্রাজ্যের অধিপতি বৃষ্ণি-সিংহ। জরাসন্ধ জামাই হত্যার প্রতিশোধ নেবেন, অতি দুরন্ত শক্তিশালী, দুর্ধর্ষ বুদ্ধিমান কৃষ্ণকে বাঁচিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কৃষ্ণ তা জানতেন, অতএব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করার ইচ্ছাকে সমর্থন করেছিলেন। কেবল সমর্থনই করেছিলেন? পাণ্ডবদের ক্রমে বলীয়ান হয়ে ওঠার মূলে তাঁর অবদান অনেকখানি। অর্জুন যে-মুহূর্তে পাঞ্চালীকে লাভ করে, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কামারশালায় গিয়ে উঠেছিলেন, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলরামকে সঙ্গে করে সেখানে গিয়েছিলেন। প্রথমেই পরিচয় কুন্তীকে—তুমি আমার পিসীমা। যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন আমার পিসতুতো ভাই।

যদুবংশের জ্ঞানী ও বীর, বন্ধু ও কর্মী বাসুদেবের আত্মীয়তাও কম নয়। সেই থেকে শুরু। ক্রমবর্ধমান বলশালী বিত্ত ও ক্ষমতাশালী পাণ্ডবদের অন্তরের ভাষা তিনি পড়তে পেরেছিলেন। সেই কারণেই তিনি মহান। ইতিবৃত্তের প্রতিটি পংক্তিতে আমি দেখছি, লিখিত ভাষার গভীরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বাসুদেবের মহিমময় ভবিষ্যৎকীর্তির ইঙ্গিত। মুখ ফুটে না বললেও, যুধিষ্ঠিরের অন্তরে রাজসূয় যজ্ঞের বাসনা তিনিই জাগিয়েছিলেন। অতএব অনুমতি প্রার্থনা মাত্রই, যজ্ঞের সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে জরাসন্ধ বধ নিশ্চিত হতে হবে।

দুর্মদ শত্রুনিধনকারী কৃষ্ণ কি আগে থেকেই ভেবে রাখেন নি, জরাসন্ধকে

মহাসমরের সুবিশাল প্রাঙ্গণে ডেকে নিয়ে এসে নিধন করা, সসাগরা ধরণীর সকলের পক্ষেই অসম্ভব ছিল? ভেবেছিলেন। ইতিবৃত্তের লেখায় তা প্রচ্ছন্নরূপে রয়েছে। কিন্তু জরাসন্ধ বধ কাহিনীতে কী দরকার?

দরকার একটি সংশয়িত জিজ্ঞাসার জন্য। মহাসমরের বদলে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে, ভীমের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিলেন? না কি তিনি, ভীম এবং অর্জুনসহ নিতান্ত স্নাতকের বেশে, মগধ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন? এবং তারপরে গুপ্তহত্যা?

না, প্রাচীন ইতিবৃত্তকে আমি এতোটা অপরিচ্ছন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবতে পারি না। সংশয়টা এই কারণে জাগে, যে-ধুরন্ধর মহাবল জরাসন্ধের ভয়ে স্বয়ং কৃষ্ণকে সকল যদুবংশের প্রধানগণকে নিয়ে মথুরা থেকে সুদূর পশ্চিমের দ্বীপান্তরে চলে যেতে হয়েছিল, তাঁকে হাতের কাছে পেয়েও জরাসন্ধ ছেড়ে দিলেন কেমন করে? স্পষ্টতই তিনি জরাসন্ধের রাজপুরে প্রবেশের জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ভীম অর্জুনকে নিয়ে স্নাতকের ছদ্মবেশে জরাসন্ধপুরীতে প্রবেশ করেছিলেন। কাছে গিয়ে পরিচয় দিয়ে, তিনজনের যে-কোনো একজনের সঙ্গে জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন।

দেখছি, দ্বন্দ্বযুদ্ধের রীতিটা প্রাচীন ভারতেও ছিল। সাহেবরাই কেবল দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতেন না। কৃষ্ণের সকল মহানুভবতাকে মেনে নিয়েও এই মুহূর্তে জরাসন্ধকে আমার সত্যবন্ধ রাজা বলে মনে হচ্ছে। তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বীরের যা ধর্ম। ভীমকেই তিনি প্রথমে বেছে নিয়েছিলেন। অবিশ্যি ভীমই প্রথম এবং শেষ। জরাসন্ধ অর্জুন আর কৃষ্ণের সঙ্গে লড়বার অবকাশ পান নি, নিহত হয়েছিলেন ভীমের হাতেই। কৃষ্ণ কি একথাও জানতেন, জরাসন্ধ ভীমকেই প্রথমে বেছে নেবেন?

তবে হে বাসুদেব, তোমার তুলনা তুমিই! অন্যথায় যে-কোনো ছদ্মবেশেই হোক কোন্ সাহসে তুমি জরাসন্ধপুরীতে প্রবেশ করেছিলে? যাঁর ভয়ে তুমি সুদূর পশ্চিমে চলে গিয়েছিলে? সবই দেখছি, দৌপদীর স্বয়ংবর সভা, পাণ্ডবগণের পরিচয় লাভ, তোমার দূরদৃষ্টি, তোমার মাহাত্ম্যকেই বৃদ্ধি করেছিল। শত্রুকে তো নিধন করাই শ্রেয়ঃ!

দ্বারাবতীর পথ ক্রমে দুর্গম হয়ে উঠছে। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের আখ্যানটুকু শেষ করি। সে তো কৃষ্ণবিদ্বেষী রাজা মহারাজা বলবান ব্যক্তিরাও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যাবেন। শৃঙ্গ দিয়ে তৈরি ধনুক, যার নাম শার্ঙ্গ সেই শার্ঙ্গপানি, গদা-চক্রধারী কৃষ্ণই নিশ্চয় যজ্ঞস্থল রক্ষা করবেন। যুধিষ্ঠির পূজা ও পাদ্য-অর্ঘও নিশ্চয় কৃষ্ণকে দেবেন। তখন একটা গোলমালের সম্ভাবনা নিশ্চিত!

আবার সেই গোলমালে গোলমালে...। ঘটেছিল সেইরকমই। যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার জবাবে ভীষ্ম বলেছিলেন, পূজা পাবার ক্ষেত্রে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। তিনি নিখিল বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী, নিরহংকারী, জ্যোতিষ্ক মধ্যে উজ্জ্বলতম...অনেকের সঙ্গে সব থেকে বেশি বাদ সাধলেন চেদিরাজ শিশুপাল। তাঁর মতো মহীপতি থাকতে, কৃষ্ণ কেন পূজা পাবেন? তিনি কৃষ্ণের নামে অতিমাত্রায় কুৎসা গীত করলেন, বাসুদেবকে নীচাশয় থেকে শুরু করে, কোনোরকম খারাপ কথা বলতেই বাদ রাখলেন না। যজ্ঞস্থলে গোলমাল লেগে যাবার দাখিল।

কিন্তু যজ্ঞস্থলে কি হত্যার প্রচলন ছিল? ছিল। অন্যথায় কৃষ্ণ তাঁর আয়ুধ-সকল নিয়ে যজ্ঞস্থলে যেতেন না। শিশুপাল যখন যজ্ঞে এবং কৃষ্ণপূজায় বাধা

দিয়ে সব ভেস্তে দেবার তাল করলেন, তখন কৃষ্ণ রুখে রেগে ওঠেন নি। বরং উপস্থিত সকলের সামনে শিশুপালের পূর্ব অপরাধের কাহিনীগুলো বলেছিলেন। তার মধ্যে সব থেকে বড় অপরাধ যাদবগণের অশেষ অনিষ্টসাধন। বিচিত্র এই, শিশুপালও ছিলেন সম্পর্কে কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। কৃষ্ণ যখন প্রাগজ্যোতিষপুরে নরককে হনন করতে গিয়েছিলেন শিশুপাল সেই অবকাশে দ্বারকা আক্রমণ করেছিলেন। দ্বারকাপুরী পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শিশুপালের অপরাধ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। মৃত্যু তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে এসেছিল। তিনি অন্যান্য মহীপালদের প্ররোচনায় নিজের ক্ষমতার প্রতি অতি বিশ্বাসে, রাগে অহংকারে এতই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, প্রকৃত সংগ্রামের ক্ষমতা তিনি হারিয়েছিলেন। কৃষ্ণ অবিশ্যি বলেছিলেন, শিশুপালের মা তাঁকে তাঁর পুত্রের শত অপরাধ ক্ষমা করতে বলেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সেই শত অপরাধ অতিক্রান্ত হয়েছিল, অতএব কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তকটি উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কথা হচ্ছিল মেকি বাসুদেবকে নিয়ে। পৌণ্ড্রক বাসুদেব, কৃষ্ণবিদ্বেষী। নামের ফের নিয়েই বিষয়টার সূত্রপাত হয়েছিল। শিশুপাল হত্যা দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল, গোলেমালে গোলমাল। কৃষ্ণের ক্ষতি করা গেল না। কিন্তু সে নিজেকে বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে চায়, পুরুষোত্তম বাসুদেব বলে। কৃষ্ণের চিহ্ন এবং আয়ুধ সেও ধারণ করে বেড়াতো।

কৃষ্ণ এ ব্যাপারে রূপোলী পর্দার কুমারদের মতোই নির্বিকার ছিলেন। কাকেরা ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করলে কী করা যায়? কিছু করা যায়? পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিষাদরাজ একলব্যকে এবং আরো কিছু কৃষ্ণবিদ্বেষীকে নিয়ে দ্বারকার আশেপাশে তক্‌কে তক্‌কে রইল, কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে দ্বারাবতী ধ্বংস করবে। এই নকল বাসুদেব দেখছি সব বিষয়েই নকল করতে চায়। কৃষ্ণ যখন নরককে হত্যা করতে গিয়েছিলেন, শিশুপাল সেই অবসরে দ্বারকা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। নকল বাসুদেবও তাই করেছিল। কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে সে গভীর রন্ধ্রে দ্বারকা আক্রমণ করেছিল। দ্বারকার যাদবেরা সারা রাত্রি লড়াই করেছিলেন। যুদ্ধটা খুব ছোটখাটো হয় নি। কিন্তু কৃষ্ণ এসে পড়েছিলেন রাত পোহাতেই। নকল বাসুদেব এবার আর রেহাই পেল না। সে কৃষ্ণের হাতেই নিহত হয়েছিল। একলব্য পালিয়ে বেঁচেছিল, অবিশ্যি পরে একলব্যও কৃষ্ণের হাতেই নিহত হয়েছিল।

কিন্তু নামের ফেরে মানুষ ফেরে, এও কোথা দেখি নাই। নকল বাসুদেব থাক। এখন আসল বাসুদেবের দ্বারাবতী যাত্রা ত্বরা করো হে। যাত্রা ত্বরা করো। ঠিকানা খোঁজ। ধুলো উড়িয়ে চলো।

চলবো, কিন্তু পথ বড় গহন। এ যাত্রা কাঁধে ঝোলা চাপিয়ে ঠেলাঠেলি করে রেল গাড়িতে যাওয়া না। যদিও এ যাত্রায়ও দেখছি বাঁশী বাজে, নিশান ওড়ে, তবে সেটা এই আমলের ভেক পাতলুন পরা গার্ড সাহেবের নিশান বাঁশী কিছু না। এ বাঁশী প্রাণের কোথায় যেন বাজে, সুরে ডাক দিয়ে ঘরের বাহির করে নিয়ে যায়। নিশানটা চোখের সামনে চিত্রের মতো ভাসে। রৈবতক পর্বতের কৃষ্ণনীল মহীরুহের মাথা ছাড়িয়ে যেন সেই নিশান পত্‌পত্ করে ওড়ে।

না, রেলগাড়ির ঝুকঝুক শব্দে কিংবা মোটর গাড়িতে এমন কি হাওয়াই

জাহাজেও আমার গন্তব্য দ্বারাবতী যাওয়া যাবে না। আমাকে পথ পরিক্রমা করতে হবে স্বয়ম্ভুব মনু কাল থেকে রচিত ইতিবৃত্তের বর্ণনা থেকে। কারণ আগেই সূতের মুখে শুনে এসেছি স্বয়ম্ভুব মনুকালই আদি কালবিন্দু গণ্য করা হয়েছে। বিলেতের ঐতিহাসিকরা যেমন যীশু জন্মের তারিখকে আদি কালবিন্দু ধরে বি সি আর এ ডি-র হিসাব কষেছেন।

আমাদের প্রাচীন ইতিবৃত্তের ব্যাখ্যাকার পণ্ডিতগণ স্বয়ম্ভুব মনুকাল থেকে অনায়াসেই যীশুর জন্ম সালকে হিসাবে আনতে পেরেছেন। সন্দেহ আর তর্ক? শ্রম করে করে এসো গিয়ে। দ্বন্দ্বে আহ্বান করতে এলে ক্ষমতা থাকার দরকার। কোনো কোনো সাহেবিয়ানার হিসাব যথার্থ, বাকিরা সব ধুলোয় যাবে তা হয় না।

কৃষ্ণের জন্মকাল আমাদের সুবিধাজনক প্রচলিত মানের হিসাবে এক হাজার চারশো আটান্ন খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল এক হাজার চারশো ষেল খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই হিসাবে দেখছি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের বয়স বিয়াল্লিশ বৎসর। আদি কালবিন্দু থেকে একে একটি যুগকাল বলা হয়েছে। যুগকাল মানেই, এক একটি যুগের সংক্রান্তি। যাওয়া আর আসার মধ্যবর্তী সময়।

এইখানটিতে এসে আমার মনে একটা খটকা লাগছে। আমি যে-সূতগণের ইতিবৃত্তকে অনুসরণ করছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয় আমার অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, ইতিহাসের বিচারক। তাঁর সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, এই উনিশশো আটাত্তর খৃষ্টাব্দ থেকে ধরলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, ৫০৭৮ বছর আগে। এ ক্ষেত্রে মনে করি, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়, সূতগণের ইতিবৃত্তীয় সংকেতকে আমার থেকে অনেক বেশি সম্যক অনুমান করেছিলেন। তাঁর মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠিরের বয়স ৭২, ভীম ৭১, অর্জুন ৭০, নকুল সহদেব ৬৯। কৃষ্ণকে যদি অর্জুনের সমবয়সী ভাবা যায়, বা অন্য মতে এক বছরের কনিষ্ঠ, তা হলে সেই সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর অথবা ঊনসত্তর।

ইতিবৃত্ত রচনা আমার লক্ষ না। কিন্তু ইতিবৃত্তীয় লক্ষণগুলো আবশ্যক। অতএব উভয় মতই বলে রাখলাম। পাঠকদের বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

কৃষ্ণের জন্মকালে পুরাণকাররা দেখছেন দ্বাপরের অংশে ক্ষয় ধরেছে। এই সময়টিকে বলা হয়েছে কলির সন্ধ্যাকাল। তবে তখনো সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশমধ্যবর্তী কলিযুগ পড়ে নি। কৃষ্ণের জীবিতকালের মধ্যেই কলিযুগ এসেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু যদুগণের কীর্তিবর্ধনকারী বাসুদেবের জীবিতকাল পর্যন্ত কলির প্রাদুর্ভাব স্পষ্টত ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। এ কথায় কি একটু বেশি গৌরব প্রকাশিত হয় নি? সূতেরা এবং ঋষিরা মানুষ ছিলেন। ইতিবৃত্তের ক্ষেত্রে তাঁরা যতোটা সম্ভব নিরপেক্ষ থাকবারই চেষ্টা করেছেন। সেইজন্যই ইতিবৃত্তের বর্ণনার গভীরে প্রচ্ছন্ন সংকেত আর ইঙ্গিতগুলোর কথা আমি বারে বারে বলেছি।

কৃষ্ণ যে কলির যাবতীয় লক্ষণগুলোকে প্রকটিত হতে দেখেছিলেন, ইতিবৃত্তে নানাভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক আগেই তাঁর মা সত্যবতীকে ঘোষণা করেছিলেন, 'যদুগুক্ষয়ের সমস্ত লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে, অমঙ্গলের ছায়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ঘোর দুর্দিন আসন্ন। যে-সব পশুপক্ষীরা দিনের আলোয় নিজেদের স্বর ও আকৃতি গোপন রাখতো তারা

ব্যতিক্রম ঘটছে। লোকক্ষয় অনিবার্য। মানুষের বিশেষত সম্বংশীয় রাজপুরুষদের চরিত্র নষ্ট হতে বসেছে। জ্ঞাতিগণ পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এ সবই ধ্বংসের লক্ষণ।'

একদিকে যখন বৃষ্ণিসংহের অশেষ গুণকীর্তন হচ্ছে, তখনই যদুগুক্ষয়ের কথাও বলা হচ্ছে। কিন্তু আপাতত আমি ইতিবৃত্তের সে-পথে যাত্রা করতে চাই না। যদি মনে করি দ্বাপরের অংশক্ষয়ের কালে, কৃষ্ণই দ্বাপরের শেষ পুরুষ, তবে তাঁর আলোর বৃত্তেই যাত্রা করি। সেই আলোর বৃত্তের ঠিকানা দ্বারাবতী।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যদি কৃষ্ণের বয়স বিয়াল্লিশ হয়, তাঁর বয়সের হিসাবে বয়সটাকে যুবকাল বলা যায়। তা হলে মথুরা থেকে রাজ্যপাট গুটিয়ে নিয়ে পশ্চিম উপকূলে চলে যাওয়ার ঘটনা তার মধ্যেই ঘটেছিল। এ ক্ষেত্রে আমি কৃষ্ণের বয়স হিসাব করতে যাবো না। কারণ অন্য মতের কথা আগেই বলেছি। বিয়াল্লিশ না হয়ে ঊনসত্তর হলেও আমার সার বক্তব্যের ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমি ইতিবৃত্তের আশ্রয় নিয়েছি মাত্র। নির্ঘাৎ ইতিবৃত্ত লিখতে বসি নি। একে কি ইতিবৃত্তাশ্রয়ী কাহিনী বলে? যা বলার তোমরা বলো, আমি পথ চলি। দেখছি, মথুরা থেকে কৃষ্ণ সহজে নড়েন নি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীর মিলিত সৈন্যসংখ্যা ছিল আঠারো অক্ষৌহিণী। সম্রাট জরাসন্ধের একলারই ছিল কুড়ি অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনী। আর যদুকুলে তখন ছিল আঠারো হাজার বীরপুরুষ। কৃষ্ণসহ কিছু রথীবৃন্দ। জরাসন্ধ বেশ কয়েকবার মথুরা অবরোধ করে যাদবদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণের সেনাপতিত্বে প্রত্যেকবারেই জরাসন্ধ প্রতিহত হয়ে ফিরে গিয়েছেন। কৃষ্ণের হাতে তাঁর পরাক্রমশালী যোদ্ধা হংস, ডিম্বক, এমন কি কালযবনের মতো বীরও মারা পড়েছিলেন।

কিন্তু এভাবে কতোকাল কাটানো যায়? প্রতি মুহূর্তে শত্রুসৈন্যের অবরোধ আর আক্রমণে, সকল যাদবেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা গোটা যদুবংশের ক্ষয়ের আশঙ্কা করেছিলেন। অতএব, তাঁদের একটি মন্ত্রণাসভা নিশ্চয় বসেছিল, সেখানে স্থির হয় যাদবরা তাঁদের বিপুল সম্পত্তি ভাগাভাগি করে যা পারেন, সব নিয়ে পশ্চিম উপকূলে চলে যাবেন। সন্দেহ নেই, এর নেতৃত্ব নিয়েছিলেন বাসুদেব স্বয়ং।

তিনি কি আগেই পশ্চিমের সমুদ্রোপকূলে রৈবতক পর্বতের সেই দেশটি দেখে এসেছিলেন? নির্বাচন করেছিলেন সেই স্থান? কোথায় সে দ্বারকা? কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের জুনাগড় রাজ্যের যে শহরকে এখন জুনাগড় বলা হয়, সেখানেই কী? গির্নারের পর্বতমালাই কি রৈবতক? রৈবতক পাহাড়ের ওপরে কুশস্থলী নামক যে সুদৃঢ় পুরী তৈরি করেছিলেন সে স্থান কি আজকের গুজরাটের দ্বারকা?

সন্দেহ আছে। এই সন্দেহটি খণ্ডনের সংকেত পুরাণেই আছে। পুরাণকারেরা প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প, নদীসমুহের গতি পরিবর্তন ইত্যাদি সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কূল ভাঙে, ও কূল গড়ে, এ তো আমরা একালেও কম দেখলাম না। তা প্রলয়ঙ্কর না হতে পারে, কালে কালে, অতি ধীরে ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এ অভিজ্ঞতা প্রাচীন ইতিবৃত্তের সঙ্গে আজকের ভৌগোলিক স্থানগুলোর প্রভেদেই আমরা পেয়েছি।

পুরাণ বা ইতিবৃত্তের মতামতগুলো তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

দধীচির কথা আমি ইতিপূর্বেই শুনেছি। জলাশয়ের বিশাল প্রাণীটি মুনি নামে আখ্যাত হয়েছিলেন। ধ্বংস বা সৃষ্টি সব কিছুর কারণকেই একটি রূপ দান করা হয়েছে। চোখের সামনে যে-রূপে দেখা গিয়েছে, সেই রূপের ওপরেই তাকে একটি বিশেষ মূর্তির পরিকল্পনায় তুলে ধরা হয়েছে। পাতালসমূহের শেষভাগে বিষ্ণুর শেষনামা তামসী মূর্তিকে অনন্ত বলা হয়েছে। এই অনন্ত-র শক্তি ও বীর্যের বর্ণনা দেবতারাও দিতে সমর্থ ছিলেন না।

কেমন দেখতে সেই অনন্ত? তিনি সদাঘূর্ণিত লোচন, অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্বতের ন্যায় শোভা পান। তিনি (যেন) মদনোন্মত্ত। পরিধানে নীলবাস (সমুদ্র?)। তাঁর এক হাতে লাঙ্গল, আর এক হাতে মুষলের কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর মুখ সমূহ থেকে উজ্জ্বল বিষানলশিখাযুক্ত সংকর্ষণনামা রুদ্র নির্গত হয়ে ত্রিভুবন ভক্ষণ করেন। তিনি যখন সদাঘূর্ণিতলোচনে জৃম্ভা পরিত্যাগ করেন, তখন সমুদ্রসলিলে কাননসমূহের সহিত এই ভূমি কম্পিত হয়। এঁর অগ্নিময়ী সহস্র ফণা আছে।

তা হলে ইনি ভূগর্ভস্থ অগ্নি? ঋষিগণ ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুৎপাত দেখেই এই কল্পনা করেছিলেন। তাঁদের মতে, এই অগ্নিজাত শক্তিই পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কঠিন স্তর ধারণ করে আছে। অভ্যন্তর অগ্নিময়। সেই আগুনের হাজার জিহ্বার সংকোচন প্রসারণেই ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির উৎপাত ঘটে। বাসুকী নাগের কল্পনার সঙ্গে এর কোনো অমিল নেই। আগ্নেয়গিরি থেকে যে ভস্মরাশি ছড়িয়ে যায়, তাকেই স্তবের গৌরবে বলা হয়েছে, সুবাসিত হরিদ্রা বা কপিলবর্ণের হরিচন্দনের রেণু। এসব তুলনা। ভূকম্প আর অগ্ন্যুৎপাতের আনুষঙ্গিক বজ্রধ্বনিকে সংকর্ষণের স্বস্তিক চিহ্নের দ্বারা উপলক্ষিত হয়েছে। মাটি ফেটে চৌচির হওয়া ধ্বংসকে, লাঙল আর মুষলের ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা।

দেখছি 'যাঁহাকে আরাধনা করিয়া পুরাণর্ষি গর্গ জ্যোতিঃতত্ত্ব আর সকল নিমিত্ততত্ত্ব অবগত হয়েছিলেন,' সেই গর্গই ছিলেন ভূকম্পবিৎ। কিন্তু পুরাণের ব্যস্ত করার ভঙ্গি ও ভাষা এইরকম, তিনি সেই অনন্তের আরাধনা করেই, সংকর্ষণের আরাধনা করেই জ্যোতিঃতত্ত্ব আর নিমিত্ততত্ত্ব লাভ করেছিলেন।

আমাদের আধুনিক ভাষায় কী বলা যায়! বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে জয় করলেন। পুরাণে অবতার কল্পনা একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণভ্রাতা বলরামকে তেমনই একজন অবতার রূপে কল্পনা করা হয়েছে। কেন? এই প্রকৃতির সঙ্গে কি তাঁর প্রকৃতির কোনো মিল ছিল? ছিল। বলরামও সর্বদাই সদাঘূর্ণিতলোচন মদমোত্ত থাকতেন। লাঙল মুষলও তাঁর হাতে থাকতো, হয়তো তাঁর আয়ুধ ছিল সেইরকম। তিনি যে প্রায় সময়েই মদিরাপানে লিপ্ত থাকতেন, তা তো দেখাই গিয়েছে। ক্রোধে হুংকারপ্রবণতা ছিল। তাঁর বিরুদ্ধকে সবাই ভয় করতেন।

এখন বৃন্দাবনের ধারেই যমুনা। বর্তমান মথুরা থেকে বৃন্দাবনে যেতে মোটরযানে সময় লাগে এক ঘন্টারও কম। কিন্তু কংস-দূত অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণ আর বলরাম যে বৃন্দাবনে ও মথুরায় গিয়েছিলেন, তার ইতিবৃত্তীয় বর্ণনা অন্য এক ভৌগোলিক চিত্রের পরিচয় দেয়। বিমল প্রভাতে, অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণ আর বলরাম অতি বেগবান অশ্বসমূহযুক্ত রথারোহণে যাত্রা করলেন। মধ্যাহ্নে এসে উপস্থিত হলেন যমুনার ধারে। সেখানে স্নানাদি সেরে আবার রথে উঠলেন। অক্রূর বায়ুবেগবান

অশ্বগণকে অতি দ্রুত চালিয়ে, অতি সায়াহ্নে অর্থাৎ সায়াহ্ন অতীত হলে, তাঁরা মথুরায় পৌঁছুলেন।

বেগবান অশ্বযুক্ত রথ ঘন্টায় সাত আট মাইল যেতে পারে। এটা আমার হিসাব না, ব্যাখ্যাকারের। তা হলে বিমল প্রভাতে বেরিয়ে মধ্যাহ্নে যমুনার ধারে পৌঁছুতেই চল্লিশ মাইল ছুটতে হয়েছিল! তারপরে অতি সায়াহ্নে মথুরা মানে আরো চল্লিশ মাইল। একুনে আশী মাইল দূরত্ব! আরো একটা কথা এখানে অনিবার্য ভাবেই অনুমান করা যাচ্ছে, অশ্বযুক্ত রথসমূহ নিশ্চয়ই নৌকাযোগে পারাপার করার ব্যবস্থা ছিল। নৌচালনাপটু কথাটা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মনে রেখো।

তা হলে যমুনা তীরে বৃন্দাবন এলো কী করে? নাকি যমুনাই বৃন্দাবনের তটে এসে ঝাঁপ দিয়েছিল? কারণ কী? ভূমিকম্প?

হ্যাঁ, ভূমিকম্প। পুরাণকারেরা তা দেখেছিলেন, আর এইভাবে তা ব্যক্ত করেছেন। একদা বলরাম বৃন্দাবনে মদিরাপানে বিহ্বল আর ঘর্মাক্ত হয়ে স্নান করতে চাইলেন। তিনি যমুনাকে ডেকে বলেন, হে যমুনে, তুমি এইখানে এসো। বলভদ্রের মাতলামিতে কান না দিয়ে যমুনা আপন মনে নিজের প্রবাহেই চললেন। তখন লাঙ্গলী বলদেব রেগে আগুন হয়ে, লাঙল দিয়ে যমুনাকে আকর্ষণ করে বললেন, রে পাপে, আসবে না? এবার যাও দেখি, কেমন যেতে পারো? যমুনা আসতে বাধ্য হলেন।

বলভদ্রের বর্ণনাটা কীরকম? তিনিও সংকর্ষণের মতো নীলবাসযুক্ত, এক কুণ্ডল, মালা, মুষল ও হলধারী। বলরামকে সংকর্ষণের অবতার রূপে কল্পনাটা পরবর্তীকালে। ভূমিকম্পটা ঘটেছিল আগেই। পুরাণকার পরবর্তীকালে বলরামের প্রকৃতি, আচরণ আর বীরত্বের সঙ্গে একটি তুলনা দিয়েছিলেন। ওটাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

বিষয়টি উল্লেখ করলাম এই কারণে, জানা গেল, এ-বৃন্দাবন সে-বৃন্দাবন নয়। যমুনার গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সেই বৃন্দাবন যমুনাগর্ভে গিয়েছিল। এ বৃন্দাবন পরবর্তীকালে মথুরার কাছে প্রতিষ্ঠিত। এ সবেরই উদ্দেশ্য অবিশ্যি দ্বারাবতী যাত্রাপথের হদিস করে নেওয়া। তা হলে, এই মুষল ও হলধারী প্রমত্ত বলরামকে নিয়ে আর একটি ঘটনাও বলে নিই।

কৃষ্ণের ছেলে জাম্ববতীতনয় বীর শাম্ব দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণাকে বলপূর্বক হরণ করেন। ফলে যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল। কর্ণ, দুর্যোধন আরো অনেক কুরুবীরেরা শাম্বকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে পরাজিত করে বন্দী করেছিলেন। যদুবংশের সন্তান শাম্ব। বলভদ্র নিজে শাম্বকে ফিরিয়ে দেবার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধ করেছিলেন। জবাবে, দুর্যোধন তাঁকে নানা কটু কথা শুনিয়ে অপমান করেছিলেন। তখন হলায়ুধ ক্রোধে মত্ত ও আঘূর্ণিত হয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে বসুধা বিদারিত করেন। তিনি মদলোলাকুলকণ্ঠে বললেন, কুরুকুলাধীনা হস্তিনানগরীকে, কুরুগণসহ উৎপাটিত করে ভাগীরথী মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। বলে মুষলায়ুধ বলরাম কর্ষণার্বোমুখ লাঙ্গল হস্তিনাপুরীর প্রাকারে বিঁধিয়ে টান দিলেন।

নগরী সহসা আঘূর্ণিত হতে দেখে কৌরবগণ, 'হে রাম, রক্ষা করো' বলে চিৎকার জুড়ে দিলেন। তাড়াতাড়ি শাম্বকে ফিরিয়ে দিয়ে তবে নিস্তার। কেবল শাম্বকে না, তাঁর বলপূর্বক হরণ করা গিন্নি লক্ষ্মণাসহ মুক্তি দিলেন। সেই

থেকে হস্তিনা নগরীকে যাঁরাই দেখেছেন, দেখেছেন গোটা নগরীটি যেন মোচড়ানো। ইঙ্গিত একটাই, সেই ভূমিকম্প! যদুবীর বলরামকে সেই কাহিনীর সঙ্গে গ্রথিত করা।

কিন্তু আমি ভাবছি শাম্বর কথা। বন্দী অবস্থায় হঠাৎ ভূমিকম্প! বোধহয় ভাবতেই পারেন নি, লক্ষ্মণাকে লুঠ করে আনতে গিয়ে, কুরুদের সঙ্গে এরকম একটা লড়াই লেগে যাবে, আর তারপরেই সেই ভূমিকম্প! তখন কি তিনিও ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছিলেন? লক্ষ্মণা থাক, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি! না, আসলে বোধ হয় শাপে বরই হয়েছিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটি নগরী বেঁকে-চুরে মোচড় খেয়ে গেল, লোকেরা হা রাম! করে দিকে দিকে দৌড়। চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা। এদিকে যদুবংশের বীরেরাও এসে পড়েছিলেন। অতএব শাম্বর মুক্তি পেতে আর বাধা কোথায়?

হিন্দু চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এমনও হতে পারে, কুরুরা ভেবেছিলেন শাম্বকে বন্দী করার মধ্যে কোনো অশুভ ইঙ্গিত ছিল। এইক্ষণেই একটি কথা বলবার অবকাশ এলো। বলেছিলাম, যাত্রা আমার দ্বারাবতী, কিন্তু কৃষ্ণ আমার পার্শ্বচরিত্র। আমি শাম্বকে দর্শনেই বেশি ব্যাকুল। পিতা পুত্রকে এক সঙ্গেই দেখতে চাই। বেশি চাই, অপরূপকান্তি এবং বীর শাম্বকেই। কৃষ্ণ ছাড়া নাম নেই, কিন্তু শাম্ব আমাকে আকর্ষণ করছেন বেশি।

ত্বরা করো হে; ত্বরায় চলো। চলবো তো, অনেক প্রস্থ ধুলো উড়িয়ে পথের সন্ধান নিতে হচ্ছে। তার আগে একটা নির্ঘাৎ বিষয় বলা দরকার। বলভদ্র যে হস্তিনানগরীকে ভাগীরথীতে ছুঁড়ে ফেলার ভয় দেখিয়েছিলেন, ঘটনাটা ঘটেছিল তা-ই। যুধিষ্ঠিরের সাত পুরুষ পরে, রাজা নিচক্ষুর রাজ্যকালে হস্তিনাপুরী গঙ্গাগর্ভে চলে যায়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকার, দ্বারকার কুশস্থলী সুদৃঢ় পুরী? সেই রমণীয় রৈবতক পর্বত, কাননাদি ও সুমিষ্ট মনোহর জলাশয়, কোথায় ছিল সে-সব? প্রভাসতীর্থও তো কাছাকাছিই ছিল মনে হয়। পাণ্ডবগণ তীর্থ করতে বেরিয়ে যখন প্রভাসতীর্থে গিয়েছিলেন, তখন যাদবেরা তাঁদের সঙ্গে সেখানে দেখা করেছিলেন। কৃষ্ণ তো বটেই!

ইতিবৃত্তের এক স্থানে দেখছি রৈবত ককুদ্মি নামে এক রাজা কুশস্থলী পুরীর স্রষ্টা ছিলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণ সেখানেই দ্বারকাপুরী স্থাপন করেছিলেন। রৈবত রাজবংশ কোনো কারণে রাজ্যচ্যুত অথবা বংশহীন হয়েছিল। বলা হয়েছে রাজ্যচ্যুত রৈবতগণ সঙ্গীত ললিতকলা নিয়েই কালযাপন করতেন।

আমার এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমার যাত্রা কৃষ্ণের দ্বারকায়।

আমি হালের ভারতীয় ম্যাপে, মথুরা থেকে, বর্তমান দ্বারকার একটা দূরত্বের হিসাব কষেছি। না, রেলপথ বা আধুনিক রাস্তা ধরে না। মথুরা থেকে একেবারে সোজা দক্ষিণ পশ্চিমে নেমে যাওয়া। তার মধ্যে পাহাড় পর্বত নদনদী আছে। রেখাটা টেনেছি সরল রেখায়, তার ওপর দিয়েই। হিসাবে পাচ্ছি সাড়ে ছশো মাইলের মতো। কিন্তু এ দ্বারকাকে সেই দ্বারকা বলে জানি না। প্রাচীন বৃন্দাবনের মতোই সেই নগরীকে খুঁজে নিতে হবে পশ্চিম সাগরের জলের তলায়। মাউন্ট আবু বলো, আর গির্নারের পর্বত বলো, আসল রৈবতক এখন কচ্ছের

কাছাকাছি কোথাও হেথা হোথা কিঞ্চিৎ মাথা তুলে থাকতে পারে। সিন্ধুদেশে অনেকবার প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছে। পুরাণকাররা সে-কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। মহর্ষি উতংক বলেছিলেন, 'সংবৎসরান্তে ধুন্ধু অত্যাচার করে।' এই ধুন্ধু ছিলেন বলরামেরও আগে অনন্তের অবতার। উতংকের আশ্রম সিন্ধুদেশেই ছিল, এবং তিনি একটি বিশাল তপ্ত বালুকারাশিপূর্ণ অগ্নিময় স্থল দেখেছিলেন আর সেখান থেকেই আগুন বালি ভস্ম পাথর ধোঁয়া নির্গত হয়ে, মহাতল আঘূর্ণিত করতো। উতংকের কথায়, তৎকালীন রাজা কুবলয়াশ্ব (৩৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) একুশ হাজার লোক দিয়ে, সেই ভূকম্পনপীড়িত কেন্দ্রটিকে উৎখাত করবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সকলেই মারা যায়।

আধুনিক কালের আঠারোশো উনিশ খৃষ্টাব্দে দেখছি, কচ্ছপ্রদেশের দু হাজার বর্গমাইল সমুদ্রের গর্ভে চলে গিয়েছিল, আর প্রায় পঞ্চাশ মাইল লম্বা, দশ মাইল চওড়া ভূমি নতুন করে জেগে উঠেছিল। কচ্ছের রান্ বা রন্ বলে বিশাল এক জলাভূমি রয়েছে। রান বা রন গুজরাতী ভাষার একটি শব্দ। যার অর্থ নোনা জলময় অস্বাস্থ্যকর স্থান।

এই ভৌগোলিক পরিবর্তনটি আধুনিক হলেও, আমাকে একবার স্মরণ করতেই হলো। কেননা, আমার যাত্রাটা একেবারেই অত্যাধুনিক কালে। কৃষ্ণ এবং যাদবগণের প্রতিষ্ঠিত দ্বারকাপুরীর সঠিক স্থান নির্ণয়ে এই ঘটনাটি আমার যাত্রা-পথকে সুদৃঢ় করছে। কিন্তু আধুনিক কালের এই দু হাজার বর্গমাইল সমুদ্রের গর্ভে চলে যাওয়ার অনেক আগেই নিশ্চয় প্রাচীন দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে ডুবেছিল। সিন্ধু এবং কচ্ছ প্রদেশের এই সব অঞ্চল প্রায়ই প্রলয়ে ওঠা নামা করেছে, এটা বোঝা যায়। তবে কৃষ্ণ জীবিত থাকতে তাঁর দ্বারকা এবং রৈবতক পর্বতের ওপর সুদৃঢ় কুশস্থলীপুরী সমুদ্রগর্ভে যায় নি। গেলে পুরাণকারের লেখনীতে তা নিশ্চয়ই পাওয়া যেতো।

কতো বৎসর কৃষ্ণ দেহধারণ করেছিলেন? এখানে একটা ধন্দ রয়েছে। এক মতে, তিনি বেঁচেছিলেন একশো পাঁচ বছর। আর এক মতে একশো এক বছর। চার বছরের সমস্যা। সমস্যাটা তেমন একটা বড় না। কোন্‌টা বিক্ষিপ্ত কোন্‌টা বিক্ষিপ্ত না, এইটি ভাববার বিষয়। যে-হিসাব থেকে কৃষ্ণের জন্মকাল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল পেয়েছি, সেই হিসাব বলছে, বাসুদেব একশো পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন। পুরাণের এই মতটিই আমি গ্রহণ করছি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল থেকে এই উনিশশো সাতাত্তরে দাঁড়াচ্ছে, তিন হাজার তিনশো তিরানব্বই বছর। সিন্ধু দেশে কুবলয়াশ্বের ভূমিকম্পজনিত সংবৎসরের প্রলয় কাল তিন হাজার ছশো খৃষ্টপূর্বাব্দ। এই বর্তমান বছর ধরলে পাঁচ হাজার পাঁচশো সাতাত্তর বছর। কৃষ্ণের দ্বারকার অনেক আগে। পুরাণকার বলছেন, কৃষ্ণের দেহাবসানের পরে অবশিষ্ট অক্ষম যাদবগণ, রমণীগণ, বালকগণ এবং মূল্যবান অলঙ্কারাদিসহ সম্পত্ত্যাদি নিয়ে অর্জুন দ্বারকা ত্যাগ করেছিলেন। কৃষ্ণের দেহে যখন অস্তগামী আসন্ন ছায়াপাত ঘটেছে, তখন তিনি নারদকে এক সময়ে বলেছিলেন, জ্ঞাতিদের অর্ধেক ঐশ্বর্য দান করে, তাঁদের কটু-বাক্য শুনে তাঁদেরই দাসের ন্যায় রয়েছি। যাদবদের আত্মকলহ পরস্পরের সংঘর্ষ তিনি দেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে অর্জুন ভোজকুলের কামিনীগণ ও তনয়দের মার্তিকাবতনগরে পাঠিয়েছিলেন। অন্যান্য বালক বৃদ্ধ আর স্ত্রীগণকে, সাত্যকি-প্রভৃতি সরস্বতী নগরীতে পাঠিয়ে, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভের

হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তার মানে, একদা কৃষ্ণের নেতৃত্বে যাদবেরা যে-ভাবে মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন, সেটা ছিল নিরাপদ সুদৃঢ় আশ্রয়ের সন্ধান। তারপরে সম্ভবত সত্তর পঁচাত্তর বছরের মধ্যেই আত্মকলহে ধ্বংসপ্রাপ্ত, অবশিষ্ট যাদবেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। দ্বারকা পরিত্যক্ত হয়েছিল।

শুধুই এক পরিত্যক্ত নগরী? না, সিন্ধুদেশের ভূমিকম্পপ্রবণতাই কৃষ্ণের দ্বারককে গ্রাস করেছিল? তা না হলে সম্ভবত কৃষ্ণের কুশস্থলী পুরীর কোনো না কোনো নিদর্শন, কাথিয়াবাড়ে, গিরিনগরে (গির্নারে) বা জুনাগড়ে খুঁজে পাওয়া যেতো। অনুমিত হয়, জরাসন্ধের পক্ষে অগম্য কিংবা আক্রমণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব কৃষ্ণের দ্বারকা ছিল, মূল ভূমিখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন সমুদ্রের কোনো রমণীয় দ্বীপে। নৌচালনাপটুত্বের কথাটা এ সময়েই বিশেষ করে মনে আসে। অশ্বসমন্বিতযুক্ত রথ-সমূহ নিয়ে, যে-কোনো সময়েই মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে দেবার জন্য নৌবাহিনী তৈরি থাকতো।

আঠারোশো উনিশ খ্রীষ্টাব্দে কচ্ছপ্রদেশের দু হাজার মাইল সমুদ্রগর্ভে যাবার আগের কোনো সাক্ষীর বিবরণ আমার গোচরে নেই। তা হলে হয়তো কৃষ্ণের দ্বারকার কোনো সংবাদ পেলেও পাওয়া যেতে পারতো। তবে যাদবগণ যে ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে এখনো যদুবংশের পরিচয়েই ছড়িয়ে আছেন, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন কেবল দ্বারকাবৃত্তান্ত। নারদ মুনি দ্বারকায় চলেছেন। পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে, প্রভাসতীর্থেই ভ্রমণে এসেছিলেন। এত কাছে এসে, দ্বারকায় গিয়ে এক-বার যাদবদের সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাওয়াটা তাঁর যথার্থ মনে হলো না। না, তিনি আদৌ ঢেঁকিতে চেপে ভ্রমণ করছিলেন না। নিজের রথেই তিনি ভ্রমণ করছিলেন।

নারদ নামে কি একজন মুনিই ছিলেন? অথবা একাধিক ব্যক্তি? নারদ নামে কি কোনো বিশেষ সম্প্রদায় আছে? নারদীয়গণ যাঁদের বলা হয়, তাঁরাই হয়তো সেই সম্প্রদায়ের। তাঁদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানে গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বিভিন্ন রাজা এবং গোষ্ঠীপতিদের দ্বারা তাঁরা পূজিত হতেন। এই মন্তব্য ইতিবৃত্তের একটি সংকেত। তবে পুরু বংশীয় কৌরবদের ও যাদবদের, উত্থান পতনের কালের মধ্যে নারদ মুনি একজনই। ইনিই সেই নারদ। ইনিই যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি, অর্থনীতি, ভেদনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতিসমূহ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। ইনিই বিধান দিয়ে-ছিলেন কুরুবংশীয়, পাণ্ডুতনয় পাণ্ডবদের, পাঞ্চালীর সঙ্গে পাঁচ ভাই কোন্ প্রথায় দাম্পত্য জীবন কাটাবেন। ইনি অশেষ গুণশালী, চিন্তাশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ইনি সমগ্র বর্ষগুলো পরিভ্রমণ করেছেন। কিম্পুরুষবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, মধ্যস্থল, অন্তরীক্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কৈলাস কোনো জায়গা বাদ নেই। দেবতা, অসুর, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, সর্প, মানুষ সকলের সঙ্গে মিশেছেন, জীবনযাত্রা ও ধারণপ্রণালী দেখেছেন। এই সবই তাঁকে অশেষ জ্ঞানী ও গুণী করেছিল। যে-কোনো বিষয়েই তাঁর প্রীতিভাজন রাজা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিতে সক্ষম, কেবল যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া। তিনি নিজে ক্ষত্রিয় নন, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ নন, কিন্তু শত্রুদমনের কৌশল, নগররক্ষা, গুপ্তচরাদি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সীমান্তরক্ষা, পাত্রমিত্রে ভেদাভেদ, প্রয়োজনে ছলনা ও চাতুরি, রাজকোষে অর্থাগমের বিধি, ব্যয়ের নিয়ম, নগরের বেশ্যা ও অন্তঃপুরিকাদের

সঙ্গে আচরণের সঙ্গতি অসঙ্গতি, এমন কি গৃহে ও অন্তঃপুরে পরিচারক পরিচারিকাদের সম্বন্ধে যথার্থ খবর রাখা, যাবতীয় বিষয়েই সম্যক উপদেশ দানের জ্ঞান ছিল তাঁর।

পরবর্তীকালে মগধের নন্দবংশ ধ্বংসের যিনি নেতৃত্ব করেছিলেন, সেই কৌটিল্যের মধ্যেই নারদের গুণাবলী প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। সেই অর্থে মহর্ষি নারদও কুটিল। কুটিলতা এ ক্ষেত্রে নীচতা না। ন্যায় এবং অন্যায় বিষয়ে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। যার পক্ষে যা অনাচরণীয়, তার প্রতিই নারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে এবং সে-সব তাঁর কাছে অন্যায় প্রতীয়মান হলে, তিনি ক্ষুব্ধ হতেন।

এরকম ব্যক্তিকে কি রগচটা বলা চলে? বোধ হয় না। রগচটা বলতে গোঁয়ার বোঝায়। মহর্ষি আদৌ তা নন। কিন্তু তাঁর কাছে যা অন্যায় বলে বোধ হয়, তার বিহিত না করে ছাড়েন না। এ কথাটা সর্বজনে বিদিত ছিল বলেই, নারদ বা নারদ ঋষিদের সম্পর্কে সকলেরই মনে একটা ভয়ের ভাব ছিল। কেবল সাধারণ মানুষের না, সমস্ত রাজা এবং অমাত্যগণেরও। আর কুটিল হলেই ভেদবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

মহর্ষি প্রভাসতীর্থ ভ্রমণের মধ্যেই, যাদবদের গূঢ়পুরুষদের সম্যক চিনে নিতে পারছিলেন। গুপ্তচরদের আচার আচরণ চলাফেরা ভঙ্গি দেখলেই তিনি বুঝতে পারেন। এখন আবিশ্যি যাদবদের বাইরের শত্রুর ভয় আর নেই। তথাপি রাজ্য পরিচালনায় সর্বদাই সাবধানতা অবলম্বন দরকার। যাদব গুপ্তচরদের দেখে, তিনি মনে মনে তাঁদের প্রশংসাই করলেন। খুশি হলেন, বিনা পরিচয়েই তারা সকলে অতি ব্যাকুল ব্যস্ততায় মহর্ষির পদধূলি গ্রহণ করে, নিজেদের ধন্য ঘোষণা করলো। মহর্ষির পরিচয় অতি ব্যাপক, অতএব প্রভাসতীর্থে তিনি ভক্তদের কাছ থেকে সহজে নিস্তার পেলেন না।

মহর্ষি মনে মনে সুখীবোধ করলেন। সবাইকে যথাবিহিত আশীর্বাদ জানিয়ে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। সময় মতো পৌঁছুলেন দ্বারাবতীতে। যে-নৌকারোহণে তিনি ও তাঁর শকট দ্বারাবতী পৌঁছুলেন সেই নৌচালকেরা চিৎকার করে তীর-বর্তী যাদবগণকে তাঁর আগমনবার্তা জানিয়ে দিল। মহর্ষি তীরে পা দিতে না দিতেই, ভোজক, অন্ধক ও বৃষ্ণি শাখার যাদবদের গৃহে গৃহে সাড়া পড়ে গেল। কুশস্থলীপুরী আর রৈবতক পর্বতের বিভিন্ন হর্ম্যতলে, কাননে কাননে, ক্রীড়াভূমি-সমূহে সর্বত্র তাঁর আগমনবার্তা পৌঁছে গেল। তাঁর আসা মানেই, নানা দেশের নানা সংবাদ জানা, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা। অন্তরে বাহিরে কোনো সংকট থাকলে তাঁর উপদেশ লাভে তার নিরসন করা। সেইজন্য তিনি সর্বত্র পূজিত নিমন্ত্রিত।

পার্বত্য নগর প্রাকারের এবং প্রবেশদ্বারের রক্ষীরা সকলেই তাঁকে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করলো। মহর্ষি দু হাত তুলে সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। অন্ধক ভোজক বৃষ্ণি গোষ্ঠীর অনেকেই নানাদিক থেকে প্রণাম ও সমাদর করতে ছুটে এলেন। মহর্ষি খুশি আর আনন্দিত চিত্তে সকলের মস্তক আঘ্রাণ করে আশীর্বাদাদি জানিয়ে নানা কুশল জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে-এগিয়ে চললেন।

কালের একটা হিসাব দরকার। মহর্ষির এই আগমন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কতো বছর পরে? যুদ্ধের পরেও তিনি ইতোমধ্যে কয়েকবার দ্বারাবতী ভ্রমণ করে গিয়ে-ছেন। এই ক্ষণের কালটি ঠিক কখন? কৃষ্ণের বয়স আচরণ ইত্যাদি দিয়েই হিসাব করে বলা যায়, ভারত যুদ্ধের দশ বছরের বেশি বোধহয় না। তা হলে কৃষ্ণের বয়স এখন

প্রায় বাহান্ন কিংবা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের বিচারে ঊনআশি। তবু এখনো তাঁর নীলোৎপল দেহে জরা বা বার্ধক্যের কোনো লক্ষণ নেই। তাঁর জীবনসায়াহ্নের অস্তরাগে, এখনো সেই বিমর্ষ ম্লানতার কোনো ছায়া পড়ে নি। যে-সময়ে তিনি নারদকে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'জ্ঞাতিবর্গকে ঐশ্বর্যের অর্ধেক দান করে, সর্বদা তাঁদের কটুবাক্য শুনে তাঁদের দাসের মতো বেঁচে রয়েছি।'.....

আমার বলতে ইচ্ছা করছে, জীবন এইরকম। আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই তো বিশ্বের কতো রথী মহারথীর অতি ভয়ংকর আর বিষাদজনক পরিণতি দেখলাম! তুলনা আমি কারো সঙ্গেই কারোর করবো না। কারণ, আমি মনে করি, এই সব অতিমানুষ ব্যক্তিগণ সকলেই আপনিই আপনার একমাত্র তুলনা। এক-জনের চরিত্রের আলোকে আর একজনকে বিচার করা যায় না।

কিন্তু এখন এসব কথা থাক। মহর্ষিকেই অনুসরণ করি। যদুবংশে যদিও ভোজক কুলের উগ্রসেন বংশধরেরাই রাজসিংহাসনে আরোহণের অধিকারী তথাপি ন্যায়াধীশ বীর এবং কুশলী, সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হলেন, বৃষ্ণিবংশাবতংসাবতার বাসুদেব। অতএব মহর্ষি কুশস্থলীপুরীতে, আগে কৃষ্ণ সমীপে যাওয়াই স্থির করলেন। অতি রমণীয় পর্বতের ওপর কুশস্থলীপুরীর যে-অংশে কৃষ্ণ বাস করেন, সেই অংশের, কাছাকাছি হতেই বৃষ্ণিবংশীয় সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সন্তানসন্ততিরা মহর্ষিকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে এলেন। অবিশ্যি একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার, মহর্ষি সচরাচর একলা কোথাও তেমন যেতেন না। তাঁর সঙ্গে সর্বদাই কিছু জ্ঞানী ঋষিগণ থাকতেন। তাঁরা মহর্ষির শিষ্য এবং জ্ঞানমুগ্ধ। মহর্ষির সঙ্গে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ানো, একটি অতি আনন্দজনক বিষয়।

মহর্ষি কি তা বলে কখনো একলা কোথাও যেতেন না? নিশ্চয়ই যেতেন। সেরকম বিশেষ প্রয়োজন হলে তিনি ঋষিগণ সহ বিহার করতেন না। মহর্ষি কৃষ্ণ-অঙ্গনে আসা মাত্র, প্রদ্যুম্ন এবং আর আর যুবক বৃষ্ণি যাদবেরা তাঁদের নানা বিলাস, আলাপন, ক্রীড়া, অন্তঃপুরে ও বাইরের কানন ছায়ায় নারীগণের সঙ্গে নানা হাসিমুখর চতুর বাক্যালাপাদি ত্যাগ করে দ্রুত মহর্ষি সমীপে এসে তাঁকে যথা-যোগ্য সমাদরসহ প্রণাম করলেন। কৃষ্ণও অন্তঃপুরে সংবাদ পাওয়া মাত্র, ত্বরিত গতি উত্তাল জলস্রোতের ন্যায় নানা সম্ভাষণ করতে করতে ছুটে এলেন। তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর ও পূজা করার জন্য নতশিরে হাত বাড়িয়ে আহ্বান করে বল-লেন, 'মহর্ষি, আমার অশেষ সৌভাগ্য বিশ্ববিহারী আপনি আমাকে দয়া করে দর্শন দিয়েছেন। আসুন, উপযুক্ত আসন গ্রহণ করুন।'

মহর্ষি এবং তাঁর সঙ্গীরা বাসুদেবের এবং অন্যান্য বংশধরগণের আচরণে সত্যি খুব খুশি হলেন। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি চোখে একটি জিজ্ঞাসা জেগে উঠলো। বাঁ দিকে, কিছু দূরেই একটি ছায়াঘন, বিবিধ বর্ণাঢ্য ফুলের কেয়ারি ও লতাপাতায় কিছুটা আচ্ছন্ন, কানন মধ্যে অপরূপ রূপবান কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে দেখলেন, তিনি একবারের অধিক মহর্ষির দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পেলেন না। কেন, এত ব্যস্ততা কিসের?

শাম্ব সত্যি আর দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাবার অবকাশ পেলেন না, কারণ তখন তাঁর কাননবিহারিণী সহচরীদের মধ্যে একজনের মদির চোখের দিকে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। দেহ সম্ভোগ বিষয়েই আমোদজনক নানা কূট তর্ক হচ্ছিল, যে-তর্কের মধ্যেও মনে স্ফূর্তি জাগে, প্রাণ হিল্লোলিত হয়। বিশেষতঃ কৃষ্ণপুত্রদের মধ্যে শাম্ব সর্বাপেক্ষা অধিক রূপবান পুরুষ। কাঞ্চনের অধিক

উজ্জ্বল বর্ণে, তাঁর দেহে যেন, পারিপার্শ্বিক সকলেই প্রতিবিম্বিত হয়। তা সে কানন কুঞ্জ জলাশয় আকাশ পর্বত নারী যাই হোক। তাঁর অতি আয়ত চোখে সর্বদা কামনার বহ্নি অনল প্রজ্জ্বলিত হয় না, কিন্তু তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টিতে এমন একটি চিত্তজয়ী দুর্বার আকর্ষণ আছে, রমণী মাত্রেই তাঁর দর্শনে মিলন আকাঙ্ক্ষায় কাতর হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষ হিসাবে তাঁর রূপ এমনই অসামান্য, তিনি নগরের পথে বের হলে, মাতা ও মাতৃপ্রতিম দুই চারি মহিলা ছাড়া সকল যাদব-রমণীগণই, প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন যে-কোনো অলিন্দে গবাক্ষে বা সোপানে তাঁকে একবারটি দেখবার জন্য ছুটে আসেন।

দ্বারকার রমণীকুলে শাম্ব সম্পর্কে বহুতর কৌতূহল, নানা আকাঙ্ক্ষা। সকলেই জানেন, প্রণয়োদ্দীপ্ত ভাষণে ও আলাপে তিনি তুলনাহীন। অথচ কোনো ইতর ভাষা তিনি উচ্চারণ করেন না। তাঁর রতিকলাকুশলতা বিষয়ে রমণীগণ নানা কাহিনী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, অতি কামনায় অবশাঙ্গ ও মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি সকল রমণীগণের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত আছেন। যথাস্থানে যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন। ভ্রাতৃবধূদের প্রতি প্রীতি, কনিষ্ঠ কুলরমণীগণকে স্নেহের দ্বারা সুখী করেন। পুরুষরাও সকলেই প্রীত, কারণ শাম্বর আচরণ, আলাপাদি শ্রদ্ধা প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষের মন! শাম্বর পুরুষোচিত রূপ যৌবনে অনেক যাদবগণের অবচেতনেই ঈর্ষা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

শাম্ব এখন যে সহচরীটির মদির চোখের দিকে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে আছেন, সম্ভবত সে একজন গোপবালা। সর্বজনবিদিত, ষাষাবর গোপরমণীরা অন্যান্যদের তুলনায় স্বাধীনচেতা। তাদের স্ব-ইচ্ছাগমন বিষয়ে সকলেই অবগত আছে। প্রণয়-সহচরীরূপে তাদের ভূমিকা অদ্বিতীয়। শাম্ব কুঞ্জ মধ্যে সেই রমণীটির দিকে কেবল অভিভূত হয়ে তাকিয়ে নেই, যেন হতবাক বিস্ময়ে, অথচ কামনাবিহ্বলতায় স্তব্ধ হয়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে আরো কয়েক যুবতী, যারা পীনবক্ষ, ক্ষীণকটি, গুরুনিতম্ব এবং সুগৌরী। সকলেই অবিন্যস্ত, বস্ত্রাদি স্খলিত, সকলেই অপরূপদেহধারী শাম্বের অঙ্গ স্পর্শে ব্যাকুল হয়ে তাঁরা নানা অঙ্গ নিজে-দের হাতে ধারণ করে আছে। শাম্বের সঙ্গে সকলেই সুরাসব পান করেছে। এখনো করছে।

শাম্ব খালি গা। তাঁর অতি উজ্জ্বল দেহে বক্ষভাগ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। গলায় কবচযুক্ত মুক্তাহার, কানে কুণ্ডল, দুই নিবিড় আয়ত চোখ সুরাসবের গুণে রক্তিম। সকলের সঙ্গেই তিনি নানা প্রণয়সম্ভাষণে লিপ্ত ছিলেন। তার মধ্যে দেহ সম্ভোগের নানা গূঢ় রহস্য ও চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের খেলা চলছিল। বেণীবন্ধন-হীন আলুলায়িতকেশ পীনোন্নত বুকের ওপর লুটিয়ে, যে-রমণী এখন নাসারন্ধ্র কাঁপিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে মদির চোখে শাম্বকে দেখছে সে সহসা একটি কূট প্রশ্ন করেছে। বাসনাতাড়িতা রমণী যদি উড়ন্ত মরালীর মত চক্রাকারে উড়তে উড়তে পূর্ণ বৃত্তাকারে অবস্থান করে শাম্ব-সঙ্গলাভে অতিপ্রার্থিনী হয়, তা হলে শাম্ব কীরূপ আসন গ্রহণ করবেন?

এক গন্ধর্বী সুন্দরী মাথার ওপরে হাত তুলে দেহকে অর্ধচক্রাকারে রেখে ভূমিতে হাত রেখেছিল। উদ্দেশ্য শাম্বকে দেহের বৃত্তাকার কৌশল দেখাবে। প্রশ্নকর্ত্রী বাধা দিয়েছে। অন্যান্য সহচরীরাও বাধা দিয়েছে। রমণীর সেই বৃত্তাকার দেহকে কল্পনা করুন এবং আপন আসনের কল্পনা ব্যাখ্যা করুন।

সহচরীদের সুরাসব পানে ও হাস্যে কুঞ্জ মুখরিত। তারাও যেন অতি-প্রার্থিনী হয়ে, সকলেই নিজেদের বস্ত্রাকারে কল্পনা করে শাম্বসঙ্গলাভে চঞ্চল হয়ে উঠছে। শাম্ব কয়েক মুহূর্ত ভেবেই, সহসা প্রণয়াকুল হয়ে প্রশ্নকর্ত্রী সহচরীকে দু হাতে বুকে টেনে নিলেন, চুম্বন সোহাগে স্পর্শের দ্বারা তাকে আহ্লাদিত করে বললেন, তুমি প্রকৃতই চতুরা। শুনলে মনে হয়, তোমার প্রশ্ন অতিশয় কঠিন ও কূট। আসলে সহজ। ঘুরিয়ে বলেছো।

সকল সহচরীরাই শাম্বর জবাবের প্রত্যাশায় তাঁকে সর্বাঙ্গে ঘিরে ব্যূহ রচনা করলো। তাঁর পত্নী লক্ষ্মণাও সহচরীদের মধ্যেই রয়েছে। শাম্ব বললেন, রমণীর বস্ত্রাকার দেহধারণ আগে নয়, পরে। বলো ঠিক বলেছি কী না?

প্রশ্নকর্ত্রী আলুলায়িতকেশিনী পীনোন্নত সুগৌরীবালা ভুরু কুঁচকে তাকালো। কিন্তু তার ঠোঁটের তটে নিটুট হাসি তরঙ্গে ঢেউ তুললো। চোখের কালো তারা দ্রুতসঞ্চরণশীল ভ্রমরের মতো ঝিলিক দিল। কিন্তু কোনো জবাব দিল না। শাম্বর মুখ থেকেই সে এবং সকলেই জবাব শুনতে চায়।

শাম্ব বললেন, আমি যে-রমণীকে ধারণ করি, একমাত্র সে-ই তখন সেই অবস্থায় নিজের কোমল অঙ্গে বস্ত্রাকার রূপ ধারণ করতে পারে।

প্রশ্নকর্ত্রী তৎক্ষণাৎ নত হয়ে, শাম্বর জানুদেশে মাথা রাখলো। অন্যান্য রমণীরা সোল্লাসে হেসে উঠলো। কিন্তু এই সব প্রণয়োদ্দীপ্ত রঙ্গ খেলায়, শাম্ব এই মুহূর্তে কার কোপে পড়লেন, তা জানতে পারলেন না। দুরান্তের সমুদ্রমধ্যে পর্বতবেষ্টিত এই রমণীয় নগরে যাদবেরা এখন নিশ্চিন্তে জীবনধারণ করছেন। শত্রুর আক্রমণ বা যুদ্ধবিগ্রহের কোনো সম্ভাবনা নেই। বলতে গেলে পাঞ্চালরাজ, পাণ্ডব, যাদবরাই এখন ভূভারত শাসন করছেন। তাঁদের মধ্যে ঐক্যের কোনো অভাব নেই। পরাজিত রাজন্যবর্গ সকলেই আত্মসমর্পণ করে স্ব স্ব রাজ্যে এঁদেরই নেতৃত্বে বাস করছেন। কোথাও কোনোরকম ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের সংবাদ নেই। বড়রকমের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে নি। সারা দেশে এখনো আকাশে বাতাসে শোকের যেটুকু চিহ্ন ভেসে বেড়াচ্ছে, তা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশাল ক্ষয় ও ক্ষতি। এখন চারদিকে শান্তি ও স্বস্তি। একা শাম্ব না, সকল যাদব সন্তানেরাই এখন নানা ক্রীড়াকৌতুকে সময় অতিবাহিত করেন।

কিন্তু প্রদ্যুম্নের মতো শাম্বর দৃষ্টি ও চিন্তা যদি জাগ্রত হতো তা হলে তিনি মহর্ষির আগমনকে কখনো ভুলে থাকতে পারতেন না। সকল যাদব শ্রেষ্ঠগণের মতোই ছুটে আসতেন। শাম্ব আচরণাবিধি জানেন না, এমন না। তবু ভুলে গেলেন। প্রেম প্রণয়লীলা এমন ভুলের সৃষ্টিও করে। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। আর মানুষ মাত্রকেই তার মূল্য দিতে হয়।

শাম্ব প্রণয়-লীলা করুন। মহর্ষিকে দেখি।

মহর্ষি, কৃষ্ণ, পুত্র প্রদ্যুম্ন ইত্যাদি সকলের দ্বারা আপ্যায়িত ও পূজিত হয়ে নানা কুশল জিজ্ঞাসা ও আশীর্বাদ করলেন। কৃষ্ণ নানাস্থানের সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। মহর্ষি সবই তাঁকে বললেন। কিন্তু শাম্বর আচরণে তাঁর অন্তরে আগুন জ্বলছে। তাঁর প্রতিটি নিশ্বাস যেন বিষানলশিখাযুক্ত হয়ে, শাম্বকে আঘাত করতে চাইছে। সেই মুহূর্তেই তা প্রকাশ না করে নানা দেশ জনপদ আশ্রম তপোবন রাজা ও ঋষিদের বহুতর সংবাদ বললেন। কিন্তু নিজেকে তিনি অপমানিত বোধ করে ভাবতে লাগলেন, বৃষ্ণিকুলের এই রূপবান বংশধরটিকে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়।

মহর্ষি নারদ কৃষ্ণের আতিথেয়তায় যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রকাশ করে, অন্যান্য যদুবংশীয়দের গৃহে গমন করলেন। ভোজ এবং অন্ধকবংশীয়দের কাছে শাম্ব সম্পর্কে দু-একটি প্রশ্নও করলেন। শাম্বর নিন্দা কেউ করেন নি। কিন্তু মহর্ষির ক্ষুব্ধ চিত্ত তাতে বিন্দুমাত্র শান্ত হলো না। দ্বারকাত্যাগ করার আগেই, শাম্বকে একটা কোনো শিক্ষা দিতে না পারলে, তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হচ্ছিল না। তিনি বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং তাৎক্ষণিক উপায় উদ্ভাবনে বিশেষ পটু। ভেবে দেখলেন, একমাত্র কৃষ্ণকে বিচলিত করতে পারলেই শাম্বকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। পুত্রের বিরুদ্ধে পিতাকে কুপিত ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারলেই এক্ষেত্রে মহর্ষির মনস্কামনা সিদ্ধ হতে পারে। সমগ্র দ্বারকায় যাদবগণের মধ্যে শাম্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত। শাম্বর বিরুদ্ধে যদুবংশকে বিবাদে প্রবৃত্ত করা সম্ভব না। বিরোধ সৃষ্টি করতে হবে পিতা পুত্রের মধ্যেই। আর তার হেতু স্বরূপ, শাম্বর অসামান্য রূপই যথেষ্ট।

মহর্ষি কি কৃষ্ণচরিত্র জানতেন না? খুব ভালোই জানতেন। পাণ্ডবদের সংগঠিত করে সমগ্র দেশে শত্রুদের বিনাশসাধনে গভীর ভেদবুদ্ধির প্রয়োগ, বিশেষ করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয়ক্ষয়ে বিমুখ, আচ্ছন্ন ম্রিয়মাণ অর্জুনকে শত্রুরূপী জ্ঞাতিহত্যায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার অসামান্য কীর্তি এই সব কিছু সত্ত্বেও কৃষ্ণ কি পরিপূর্ণ অসংহীন? অতি কীর্তিমান মহামানবও মানুষ! জীব-ধর্মের এইটি একটি বিশেষ লক্ষণ। তাঁরও কতকগুলো সুপ্ত বোধ থাকে, অসংযত অহংকার সম্ভোগেচ্ছা, আপনশক্তিতে বিশ্বাসী নিশ্চিন্ত কালাতিপাত। আঘাত সেখানেই হানতে হবে।

মহর্ষি দ্বারকাত্যাগের আগে, কৃষ্ণের সঙ্গে একান্তে একবার সাক্ষাৎ করলেন। বললেন, 'বাসুদেব, আপনার বংশে একটি গ্লানিময় পাপের ছায়া দেখে আমি বড় বিচলিত বোধ করছি।'

প্রশান্ত কৃষ্ণ উদ্বিগ্ন বিস্ময়ে বললেন, 'আমার বংশে গ্লানিময় পাপের ছায়া? আমার চোখে পড়ে নি?'

মহর্ষি হেসে বললেন, 'চোখে পড়লে তো আপনি জানতেই পারতেন। ওপরে শান্ত জলরাশি, অথচ তলের গভীরে খরস্রোতের মতো সেই পাপের ধারা বহে চলেছে। তির্যগযোনিসম্ভূত অনার্যরাজের কন্যা, জাম্ববতী তনয় শাম্ব তার কারণ।'

কৃষ্ণ অধিকতর বিস্ময়ে বললেন, 'শাম্ব? তার বিষয়ে যদুবংশে কোনো মালিন্য নেই। আমার এই রূপবান সন্তানটি সকলের প্রিয়।'

মহর্ষি বিদ্রূপে কুটিল হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, শাম্ব সকলের প্রিয়, কিন্তু সে প্রিয়তম পুরুষ আপনার ষোল হাজার রমণীর! যে-ষোল হাজার রমণীকে উদ্ধার করে, আপনি ভর্তাস্বরূপ তাদের গ্রহণ করেছেন, যাদের প্রতি প্রেমবশতঃ স্যমন্তক মণি আপনি ধারণ করতে পারেন নি, সেই ষোল হাজার রমণী শাম্ব সঙ্গলাভে ব্যাকুল। শাম্বই তাদের ধ্যানজ্ঞান। এ কি পাপ নয়?'

কৃষ্ণ এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত হলেও পরমুহূর্তেই দৃঢ়স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, পাপ, কিন্তু আপনার অভিযোগ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। মহর্ষি, আপনি ত্রিভুবন-খ্যাত, সীমাহীন আপনার অভিজ্ঞতা। তবু বলি, আমার পুত্র ও প্রেয়সীদের বিষয়ে এই অভিযোগ আমি বিশ্বাস করি না। শাম্বর সদাচার বিশ্বস্ততা পিতৃ-ভক্তি প্রশ্নের অতীত। আমার ষোল সহস্র স্ত্রী সহচরী রমণীদের বিষয়েও আমার মনে কোনো দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই।'

মহর্ষি গম্ভীর হয়ে উঠলেন, তাঁর অন্তরের কোপানল বর্ধিত হলো। বললেন, 'আমি ত্রিভুবনখ্যাত, আমার অভিজ্ঞতা সীমাহীন। কিন্তু বাসুদেব, আপনার অন্তর্দৃষ্টি গভীর ও ব্যাপক, অতুলনীয়। যে-কোনো বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলের সাধনার বস্তু। রমণীর চরিত্র আর মন সম্পর্কে আপনি এমন দ্বিধাহীন হচ্ছেন কেমন করে?'

'কারণ আমি সত্যাশ্রয়ী।' কৃষ্ণ বললেন, 'মহর্ষি, আপনি জানেন, এই ষোল হাজার রমণী দ্বারকার যদৃচ্ছ বিচরণকারিণী। আমাদের বংশের পুরুগণ ব্যতীত, যাদবশ্রেষ্ঠগণের অনেকেই এই রমণীদের প্রার্থনা করে থাকেন, যথোচিত সমাদরের দ্বারা সঙ্গলাভও করে থাকেন। তা কোনো দূষণীয় বিষয় নয়। এদের মধ্যে আপনি বাদ দেবেন, রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, গান্ধারী (ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী নন), হৈমবতী, শৈব্যা, প্রস্থবাসিনী, ব্রতিনী এই আটজনকে। এই রমণীরত্নগণ আমার মহিষী। ষোল হাজার রমণীরত্নও স্বর্গের অপ্সরাতুল্য একান্ত আমার দ্বারাই রক্ষিত। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের সকল দায় দায়িত্ব আমার। আমি তাদের গতি-বিধি আচরণ সবই জানি।'

মহর্ষি বিমর্ষ মুখে বললেন, 'আপনি যা বললেন, সবই আমারও জানা আছে। আপনি পুত্রগণ ব্যতীত বললেন। কিন্তু শাম্ব আপনার পুত্রই।'

কৃষ্ণ বললেন, 'অবশ্যই। সেই জবাব তো আপনাকে আগেই দিয়েছি। শাম্ব এবং ষোল হাজার রমণী বিষয়ে আপনার অভিযোগ আমি বিশ্বাস করি না।'

মহর্ষির মুখ শক্ত হয়ে উঠলো, বললেন, 'প্রমাণ পেলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?'

কৃষ্ণ হেসে বললেন, 'প্রমাণ পেলে, তখন আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কী আছে? চাক্ষুষ ঘটনাই তো বিশ্বাস।'

মহর্ষি কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, 'তবে তাই হবে। প্রমাণের সুযোগ এলে, আবার আপনার কাছে আসবো। আজ বিদায় নিচ্ছি।'

কৃষ্ণ মহর্ষিকে প্রণাম করলেন। মহর্ষি কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে, মস্তক আঘ্রাণ করে বিদায় নিলেন।

কৃষ্ণের চিত্তে কোথাও সন্দেহের কোনো ছায়া ছিল না। অবিশ্বাসও তাঁর হৃদয়কে কিছুমাত্র বিচলিত করে নি। মহর্ষি নারদের অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তবু মনটা যে বিচলিত না হলো, তা না। কারণ মহর্ষি সহসা কোনো কথা বলবার পাত্র নন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপেই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে। কেন তিনি শাম্ব এবং ষোল সহস্র প্রিয়দর্শিনী প্রণয়শীলা রমণী-গণকে কেন্দ্র করে এমন একটি অমূলক অভিযোগ করলেন?' শাম্ব কি কোনো কারণে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেজাজী মহর্ষির বিরক্তি উৎপাদন করেছে? অথবা রমণী-গণ কেউ তাঁকে দেখে কোনোরকম হাস্যপরিহাসাদি করে নি তো?

কিন্তু কৃষ্ণ কারোকেই মহর্ষির অভিযোগের বিষয়ে কিছু বললেন না। কৌতূহলবশত শাম্বকে কয়েকদিন লক্ষ করে দেখলেন। ব্যতিক্রম বা বৈশিষ্ট্য কিছুই চোখে পড়লো না। শাম্ব একজন যুদ্ধবিশারদ দৃঢ়কলেবর মহাবীর। এক্ষণে নারী সঙ্গ, প্রণয়লীলা ও নানা রঙ্গরস ক্রীড়াকৌতুকে শাম্বর আসক্তি কিঞ্চিৎ বেশি। সে তার স্ত্রী ও রমণীদের সঙ্গে যেমন ক্রীড়াকৌতুকে কাল কাটিয়ে থাকে, তার অতিরিক্ত কিছু চোখে পড়লো না।

কৃষ্ণ কি ষোল সহস্র রমণীর অন্তরের কথা জানবার প্রয়াসে, তাদের মধ্যে

উৎকর্ণ ও সজাগ দৃষ্টি নিয়ে বিচরণ করেছিলেন? করলেও, তিনি কি কিছুই অনুমান করতে পেরেছিলেন? তিনি দুরন্ত মহাবল অরিনিধনকারী বাসুদেব। নরককে বধ করে তিনি এই রমণীদের কেবল উদ্ধার করেন নি। জাম্ববানের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি উদ্ধার করেছিলেন। সত্রাজিৎ কন্যা সত্যাভামাকে বিবাহ করেছিলেন। স্যমন্তক মণি যে-কোনো পুরুষের ধারণের অতি আকাঙ্ক্ষণীয়। কিন্তু ষোল হাজার রমণীকে নরকের পীড়ন থেকে উদ্ধার করে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলেই স্যমন্তক মণি ধারণ করতে পারেন নি। ইচ্ছা ছিল সত্যভামা করুন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী। যা কৃষ্ণ পারেন না, তা তিনিও পারেন না। সেই ষোল সহস্র রমণী কি কখনো কৃষ্ণপুত্র শাম্বের প্রতি আসক্তি-বোধ করতে পারে?

কৃষ্ণের একমাত্র সিদ্ধান্ত, এমন ঘটনা কদাচ ঘটতে পারে না। সঙ্গীতাচার্য মহর্ষি নারদের অভিযোগ তিনি কোনোরকমেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। বিশ্বাস করলেন না, এবং তিনি স্থিরনিশ্চিত ছিলেন, মহর্ষি কখনোই তাঁর অভি-যোগ প্রমাণ করতে পারবেন না। অতএব জনার্দন অল্পকালের মধ্যেই মহর্ষির অভিযোগের কথা বিস্মৃত হলেন। যথাবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাপনে কাল কাটাতে লাগলেন। যদিচ তাঁর এই কাল ক্রমশঃ বার্ধক্যের দিকে ঢলে পড়ছিল, আর সেই সঙ্গে যদুবংশের মধ্যে নানারকম বিবাদ বিরোধ দেখা দিচ্ছিল।

কৃষ্ণ নিজে বিশ্বাস করতেন, জীবনকালের মধ্যে দুইটি ভাগ সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। বনবাসে জীবনধারণ, অথবা রাজ্য ও সমৃদ্ধিলাভে পরাক্রান্ত সৌভাগ্য-শালী হওয়া। এর মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ভোগে কাল যাপন মানুষকে অধঃপতিত করে। বনবাসে নিরিবিলি সামান্য ধনে জীবনযাপনে শান্তি থাকে। রাজ্য-সমৃদ্ধি ইত্যাদি লাভের মধ্যে মানুষের বলবিক্রম নানা নীতি ও কূটকৌশল যুদ্ধকর্মাদিতে ব্যাপৃত থাকা, ক্রিয়াশীল জীবনের লক্ষণ। এই দুই জীবন প্রবাহের মধ্যে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। মধ্যপন্থা মানুষকে কিছুই দেয় না। অলস বিলাস ব্যসন এবং নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়ভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তখন আর নতুন করে বিকাশের কিছু অবলম্বন থাকে না। মানুষের বলবিক্রম বা তপশ্চর্যা সব কিছুই সৃষ্টিশীল। নব নবরূপে তা উদ্ভাসিত হয়।

কৃষ্ণ কি যদুবংশের মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষদের মধ্যে সেই মধ্যপন্থা অবস্থা লক্ষ করছিলেন? যখন সকলেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছিল, নিজেদের মধ্যে তুচ্ছ দলাদলি পরাক্রম বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও আস্ফালন করছিলেন? গৌরব বর্ধিত হচ্ছিল না। অতএব সম্পদও বর্ধিত হচ্ছিল না। কৃষ্ণই সর্বাপেক্ষা ভালো জানতেন, ক্ষয় ও লয় অবশ্যম্ভাবী। তিনি কি তারই অশুভ ছায়া, যদুবংশে দেখতে পেয়েছিলেন?

কিন্তু সে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে।

নারদ দ্বারকা ত্যাগ করলেও শাম্বের অবহেলা তিনি ভুলতে পারেন নি। কৃষ্ণের অবিশ্বাস তাঁর মর্মমূলে গাঁথা ছিল। কিন্তু কেন? তিনি কি সত্যি বিশ্বাস করতেন তাঁর অভিযোগ সত্য? অসামান্য রূপবান পুরুষ শাম্বর মনে হয়তো নিজের সম্পর্কে কিছু অহংকার থাকতে পারে। সে-অহংকার কিছু কিঞ্চিৎ প্রদ্যুম্ন বা চারুদেষ্ণ, কার মধ্যেই বা না ছিল? এবং মহর্ষির এ-অনুমানও হয়

তো আদৌ মিথ্যা না, বাসুদেব একান্তরূপে অসূয়াহীন ছিলেন না। মহামানবের গৌরবও চিরকাল তাঁকে আঁকড়িয়ে থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে শাম্ব প্রণয়লীলায় কখনোই অতি আসক্ত নন। কিন্তু তাঁর প্রণয়-সম্ভাষণ, কৌতূহলোদ্দীপক প্রেমলীলা, প্রণয়িনীগণের সঙ্গে তাঁর প্রণয়োদ্দীপক নানা ক্রীড়াকৌশল যা একান্ত অনায়াসসাধ্য নয়, বিবিধ আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াদির অপেক্ষা রাখে তা যদব রমণীগণের মধ্যে সুখকল্পনায় গুঞ্জরিত হতো। সেটা তাঁর কোনো অপরাধ না। কিন্তু মহর্ষি ক্রুদ্ধ হয়ে, এত বড় একটা গুরুতর অভিযোগ তুললেন কেমন করে? তাও পিতার রমণীগণ বিষয়ে পুত্রকে অভিযুক্ত এবং সে অভিযোগ পিতাকেই! মহর্ষির কি কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল এই অভিযোগের?

সম্ভবতঃ ছিল। দ্বারকায় ইতিপূর্বে তিনি অনেকবার এসেছেন। যাদবদের বিভিন্ন গৃহে গমন করেছেন। এবং এমন একটি ধারণা করবার মতো সঙ্গত কারণ তাঁর ছিল, রূপবান শাম্ব যাদবরমণীগণের অতি প্রিয় পুরুষ। তিনি কি কখনো কারোর মুখে শুনেছেন, কৃষ্ণের ষোল সহস্র রমণীগণ শাম্বকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে অভিলাষপূর্ণ প্রগল্ভালাপ করছে?

মহর্ষি নিশ্চয়ই কিছু জ্ঞাত ছিলেন। অথবা কেবলমাত্র রমণীর মন বিষয়ে, নানা দেশের অভিজ্ঞতাই তাঁকে এমন একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত দান করেছিল, কৃষ্ণকে সেই গুরুতর অভিযোগ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। তিনি দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, সর্প, মানব সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকগণের আচরণের নানা রীতি ও বৈপরীত্য বিষয়ে অবগত আছেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মহর্ষি আবার দ্বারকায় ফিরে এলেন। দ্বারকা ত্যাগ করে গেলেও আদৌ কি তিনি দূরান্তরে কোথাও গমন করেছিলেন? মনে হয় না। সম্ভবতঃ নিকটে থেকেই তিনি একটি বিশেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন। নানা শ্রেণীর ঋষিগণের মধ্যে তাঁর কোনো সংবাদদাতা ছিলেন না, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তিনি এ যাত্রায় দ্বারকায় এসেই আগে গেলেন রৈবতকের পর্বতের গহনে কৃষ্ণের প্রমোদকাননে। রৈবতকের সেই প্রমোদকাননে নানা বৃক্ষে বর্ণাঢ্য ফুলের সমারোহ। ভূমিসকল নানা পুষ্পপল্লবিত বীথি ও মনোহর সবুজ ঘাসে আস্তীর্ণ। প্রমোদকাননে বিশাল সুমিষ্ট স্বচ্ছ জলাশয়।

নারদ দূর থেকে দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর মহিষী ও ষোলসহস্র রমণীগণসহ জলকেলিতে সুখে মগ্ন। বাসুদেবকে ঘিরে জল মধ্যে নানা রমণী নানা ক্রীড়াকৌতুকে, মরালীর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। কেউ কৃষ্ণকে স্পর্শের জন্য ব্যাকুল, কেউ জল মধ্যে বিহার আকাঙ্ক্ষায় মীনসমূহ যেমন জলমধ্যে নিমগ্ন বৃক্ষের চারপাশে খেলা করে সেইরূপ করছিল। কেউ কেউ সুরাসব পানে অতি প্রমত্তা হয়ে নানারূপ প্রণয় কথা উচ্চারণ করছে। অন্যান্য বান্ধবীদের পৈষ্ঠী ও সুরাসবের পাত্র এগিয়ে দিচ্ছে। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যেই আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বাসুদেবকে অনুভব করছে। স্বভাবতই প্রমোদকানন ও জলাশয়ে রমণীরা উচ্চহাস্যে প্রগলভ কথাবার্তায় প্রমত্তা। জলাশয়ও তাদের কেলি উদ্দামে অতি উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত।

কৃষ্ণ স্বয়ং অতি উদার ও প্রমত্ত বাঞ্ছায় প্রিয় রমণীগণের সহবাসে সকলের ইচ্ছাপূরণ ও আহ্লাদিত করছেন। এই অতি প্রেমোচ্ছল জলকেলিতে বৃক্ষের পাখীরা নানা স্বরে রব করছে। বিচিত্র বর্ণের পতঙ্গসমূহ কাননের শোভা বর্ধন করছে। রমণীগণের সঙ্গে মরালীরাও জলাশয়ের অন্যপ্রান্তে নিজেদের মধ্যে

কেলি করছে।

নারদ দেখলেন, সুরাসব পানে অতি প্রমত্তা রমণীগণের অঙ্গের বসনভূষণ সকলই শিথিল ও স্খলিতপ্রায়। নিজেদের নগ্নতা বিষয়ে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। থাকবার কথাও না। কারণ রৈবতকের এই প্রমোদ কাননে ও জলাশয়ে একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণ ছাড়া কারোরই উপস্থিতির কোনো উপায় নেই। কৃষ্ণের প্রমোদকানন ও জলকেলি স্থান কৃষ্ণ ছাড়া সকলের অগম্য এ কথা দ্বারকায় সর্বজনবিদিত। কিন্তু তার অর্থ এই না, কৃষ্ণ কোনো প্রয়োজনে সেখানে কারোকে ডেকে আনতে পারবেন না। বিলাস অবকাশেও অনেক সময় কর্মজীবনের জরুরী প্রয়োজন ঘটতে পারে।

নারদ দেখলেন, এই তাঁর সেই প্রকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত। রমণীরা সুরাসব পানে ও যৌবন সম্ভোগেচ্ছায় অতি প্রমত্তা, হাস্যে লাস্যে কৌতুকে কেলিতে প্রমোদকানন মুখরিত। তিনি নগরের প্রাসাদে ফিরে গেলেন। প্রাসাদের কাছাকাছি কুঞ্জমধ্যে শাম্বকে তাঁর সহচরী পরিবেষ্টিত অবস্থায় খুঁজে পেলেন। রূপবান শাম্বকে রমণীর সোহাগে অধিকতর রূপবান দেখাচ্ছিল। নারদ কিছুটা দ্বিধা ও সংকোচ করে বললেন, 'শাম্ব, তোমাকে সুখে বাধা দিতে চাই না। বাসুদেব এখনও তাঁর রৈবতকের প্রমোদকাননে রয়েছেন। সেখানে তিনি তোমাকে স্মরণ করেছেন।'

শাম্ব তৎক্ষণাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন। মহর্ষি বাক্য কখনো মিথ্যা হবার না। পিতা স্মরণ করেছেন শোনা মাত্র তিনি দ্রুতগতি হয়ে, প্রমোদকাননে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ এমন অসময়ে, তাঁর প্রমোদকাননে কেলিস্থলে শাম্বকে দেখে অবাক হলেন। কিন্তু তাঁর ষোলসহস্র রমণীগণ, রূপবান শাম্বকে দেখে উল্লাসে মেতে উঠলো। তাদের সকলের আরক্ত সিক্ত চোখ মুখ কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। কামোচ্ছ্বাসে তারা সকলে নির্বাক হয়ে থাকতে পারলো না। কৃষ্ণের উপস্থিতি সত্ত্বেও শাম্বের রূপ নিয়ে তারা প্রগলভ গুঞ্জনে মেতে উঠলো।

নারদ বুঝলেন, এটা প্রথম ধাপ। রমণীরা এখনো তাদের যৌবনপ্রস্ফুটিত দেহ জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। অবিশ্যি সকল রমণীর মধ্যে তিনজন কৃষ্ণের নিকটবর্তী হয়ে অধোবদন ছিলেন। তাঁরা জাম্ববতী, রুক্মিণী, সত্যভামা। তাঁরা অবাক ও গম্ভীর হয়ে ছিলেন। মত্ততা দূরের কথা, কোনো প্রকারের বিকার তাঁদের ছিল না। নারদ এতক্ষণ অন্তরালে ছিলেন। এবার কৃষ্ণের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

মহর্ষিকে দেখা মাত্র তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সকল নারী জল থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। নারদকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে রমণীগণ শাম্বকে তাদের প্রস্ফুটিত যৌবন দেখাতেই অত্যুৎসাহী হয়ে উঠলো। তাদের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ বিবিধ ভঙ্গিসহকারে শাম্বর সামনে এমনভাবে উচ্ছ্রিত হলো যে, সকলের কামোচ্ছ্বাস অত্যন্ত প্রকটিত হলো। অতিমাত্রায় সুরাসবপানে, মত্ততাপ্রসূত, তারা শাম্বর প্রতি অতিপ্রার্থিনী হয়ে তাদের উজ্জ্বল রূপলাবণ্যরাশি অনাবৃত করলো।

নারদের সঙ্গে কৃষ্ণের একবার দৃষ্টিবিনিময় হলো। পরমুহূর্তেই মর্মাহত বাসুদেব ক্রোধে ও গ্লানিতে জ্বলন্ত চোখে রমণীদের দিকে তাকালেন। নারদকে তাঁর আর কিছুই জিজ্ঞেস করার ছিল না। বলবারও ছিল না। মহর্ষি যা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তা তিনি অতি নির্মম ভাবেই করেছেন। এখন তিনি পরিণতি দেখবার জন্যই দাঁড়িয়েছিলেন। কৃষ্ণ রমণীদের প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত করে ধিক্কার

দিয়ে অভিশাপবাণী উচ্চারণ করলেন, 'তোমরা আমার রক্ষিত হয়েও অতি নিকৃষ্ট আচরণ করেছো। অতি প্রমত্তা হয়ে তোমরা যেমন পণ্যাঙ্গনাদের ন্যায় ব্যবহার করেছো, আমার মৃত্যুর পরে, তোমরা তস্করদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হবে।'

কৃষ্ণের অভিশাপ যাঁদের ওপর বর্ষিত হলো না তাঁরা জাম্ববতী, রুক্মিণী এবং সত্যভামা। অন্য সমস্ত রমণীগণ মুহূর্তে তাদের অপরাধ অনুভব করে আর্তস্বরে বাসুদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। প্রমোদকাননের জলকেলি, হাস্য মুখরিত লীলাক্ষেত্র সকলই বিষাদে ডুবে গেল। কৃষ্ণ রমণীদের বললেন, ভবিষ্যতে দালভ্য ঋষির কাছে তোমাদের সম্যক জীবনধারণের উপায় জানতে পারবে।

কৃষ্ণ অতঃপর তাকালেন বজ্রাহত বিস্মিত ভীত অধোমুখ শাম্বর দিকে। শাম্বর অসাম্যান্য রূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাঁর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হলো। পুত্রকে তিনি অভিসম্পাত করলেন, 'তোমার এই রমণীমোহন রূপ নিপাত যাক। কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক।'

শাম্বর সর্বাঙ্গ আতঙ্কে শিহরিত হলো। তিনি করযোড়ে নতজানু হয়ে বাসুদেবের পায়ের কাছে ভেঙে পড়ে, কাতর স্বরে বললেন, 'পিতা, আমি স্বইচ্ছায় কখনোই আপনার প্রমোদকাননে আসি নি। আমি আমার জন্মমুহূর্ত থেকে আপনার আজ্ঞাবাহী সেবক। পিতা, আপনি জগদ্বিখ্যাত বাসুদেব। হে পুরুষোত্তম জনার্দন, হে বৃষ্ণিসিংহাবতার, এই জগতীতলে, কী বা প্রকৃতি কী বা মানুষ, আপনি সকলের অন্তর্যামী। বিশ্বচরাচরের যা কিছু অমোঘ পরিবর্তনশীলতা অথবা মানুষের অন্তরের কথা কিছুই আপনার অগোচরে থাকে না। আপনাকে কোনো কারণে অসুখী দর্শনের চেয়ে আমার পক্ষে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। কিন্তু আপনি জানেন আমি নিষ্পাপ। আমি আপনার ঔরসজাত সন্তান, সংসারে এর তুল্য সুখ ও অহংকার আমার আর কিছুই নেই। আপনার অন্যান্য পুত্রদের ন্যায় আমার দ্বারা কখনো কোনো নীতিবিগর্হিত কাজ সম্ভব না। আপনার সন্তাপ হতে পারে, এমন কোনো কুরুচিপূর্ণ আচরণের সাহস আমার কদাপি মনে ছায়াপাতও করে নি। হে সর্বজ্ঞ পিতা, আপনি আমাকে কেন এই নিদারুণ অভিসম্পাত করলেন?'

কৃষ্ণ সেই মুহূর্তে কোনো জবাব দিতে পারলেন না। বজ্রপাতের পরমুহূর্তে যেমন স্তব্ধতা নেমে আসে, তিনি সেইরূপ মৌনতা অবলম্বন করলেন। মহর্ষি, পত্র, রমণীগণ, প্রমোদ কানন কোনো কিছুর প্রতি কারো প্রতিই যেন তাঁর দৃষ্টি নেই। অথচ তাঁর বিশাল চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি শূন্য না। তিনি যেন স্থাণুর গভীর ধ্যানমগ্নতায় ডুবে আছেন।

মহর্ষি মনে মনে হাসছিলেন আর মনে মনেই উচ্চারণ করছিলেন, অসূয়া অসূয়া! হে বাসুদেব আপনার জ্ঞানই আপনাকে সর্বজ্ঞ করেছে। জ্ঞানী হয়েও রমণীর চরিত্র ও মন আপনি এই বয়সে আর একবার অনুধাবন করলেন। অতি নির্মমরূপে অনুভব করলেন রূপবান আত্মজের সামনে নিজের রমণীগণ কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলে কী দুঃসহ ঈর্ষায় অন্তর বিদীর্ণ হয়। হে পুরুষোত্তম, আপনিও তখন আপন প্রিয় পুত্রকে নির্মম অভিশাপ না দিয়ে পারেন না। আপনি প্রমাণ চেয়েছিলেন, আমি প্রমাণ দিয়েছি। আমি মিথ্যা কথা বলে শাম্বকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছি, তা ছাড়া চাক্ষুষ প্রমাণের আর কোনো উপায় ছিল

না। কিন্তু শাম্ব নিরপরাধ আপনি জানেন। জেনেও এই অভিশাপ। অমোঘ এই অন্তরের বিকার, হে বাসুদেব। আমি আর ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা করবো। শুধু সেই পরিণাম দেখে যাবো, পুত্রের কাতর প্রার্থনায় আপনার অভিশাপ থেকে মুক্তিদান করেন কী না। যদি করেন তা হলে আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। শাম্বকে আমি যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম, তা ঘটবে না।

শাম্ব তখন কৃষ্ণের পদতলে পড়ে কাতর প্রার্থনা করে চলেছেন, পিতা, আপনার কোনো পুত্রই কখনো আপনার অবাধ্যতা করে নি, আমিও করি নি। শৈশব থেকে আপনার ও আমাদের বংশের অন্যান্য অস্ত্রবিদদের কাছে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছি। যুদ্ধবিশারদ রূপে আমার যদি কোনো খ্যাতি থেকে থাকে, তবে তা আপনারই দান। আপনার নির্দেশ ও নেতৃত্বে, জরাসন্ধের মহাবল সেনাপতিদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। বলার অপেক্ষা রাখে না, আপনার অনুপস্থিতিতে এই দ্বারকানগরী যতোবার শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, যদুবংশের সকল বীরদের সঙ্গে আমিও প্রাণপণ যুদ্ধ করেছি। প্রদ্যুম্ন আর আমি অতিবলশালী শাল্বর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে দ্বারকার দূরপ্রান্তে তাড়িয়ে এসেছি। আপনার মহিমময় কীর্তি, সৌভনগরে গিয়ে সেই শাল্বকে আপনি নিজের হাতে হত্যা করেছিলেন। রাষ্ট্র সমাজ পরিবার বিষয়ে যাবতীয় শিক্ষা আপনার কাছেই পেয়েছি। রমণীদের কার প্রতি কী আচরণ করতে হয়, সেই সুনীতিজ্ঞান আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি। পৃথিবীতে আপনি সেই পুরুষ, যিনি বিশাল রমণীকুলের ভর্তা ও ত্রাতা। আমাকে ক্ষমা করুন পিতা, আমাকে অভিশাপ দেবেন না।

কৃষ্ণের স্তব্ধ মৌনতা ভাঙলো, তিনি তথাপি কয়েক মুহূর্ত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে রইলেন। তারপর বললেন, শাম্ব, আর তা সম্ভব না।

শাম্বর অতি উজ্জ্বল কান্তি স্বেদসিক্ত হয়ে বারে বারে প্রকম্পিত হলো। নারদ তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করলেন। শেষ কথা যা শোনার, তা তাঁর শোনা হয়ে গেল। তিনি প্রমোদকানন ছেড়ে, নগরীর দিকে চলে গেলেন। কৃষ্ণ একবার সেদিকে দেখলেন। বিষাদের ছায়া তাঁর মুখে। জাম্ববতী রুক্মিণী ও সত্যভামার চোখে জল। অন্যান্য রমণীগণ দ্বারকানগরীর অনন্ত বিলাস ব্যসন ও সুখের পরিবর্তে, অভিশাপ ভয়ে কাতর হয়ে তখন কেবল সেই ভয়াবহ অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন। আর মনে মনে দালভ্য ঋষির নাম জপ করছে।

কৃষ্ণের চোখে, মুখে, বক্ষে, বর্ণের উজ্জ্বলতায় কোথাও কোনোরকম ক্রোধের অভিব্যক্তি নেই। তিনি বললেন, শাম্ব, একমাত্র অভিশাপ দিয়ে যদি সকল সংকটের মুক্তি হতো তা হলে আমাকে গদা আর চক্র ধারণ করে শত্রু নিধন করতে হতো না। অভিশাপ কেবলমাত্র মনস্তাপ থেকে স্ফুরিত হয় না। সাধারণ মানুষ পরস্পরকে যে-রকম অভিশাপ দিয়ে থাকে, আমার অভিশাপ তদ্রূপ না। যা ঘটে যায়, যা ভবিতব্য তা-ই অভিশাপরূপে উচ্চারিত হয়। তোমার জন্মলগ্নেই এই কুৎসিত ব্যাধি তোমার ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। আমি অতি ক্রোধে তা উচ্চারণ করেছি মাত্র। তোমার কোষ্ঠির কাল অনুযায়ী, তোমার ব্যাধির প্রকটরূপ প্রকাশের সময় আসন্ন। বিম্ব ফলের ন্যায় তোমার দেহের এই রক্তাভ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্ফীতি, কিছুই আর স্বাভাবিক নেই। শরীরের এই লক্ষণগুলো তোমার চোখে পড়ে নি। তথাপি আমি স্বীকার করি, তোমাকে দেখে রমণীদের যৌবনোচ্ছ্বাসে ক্রুদ্ধ হয়েই তোমাকে অভিসম্পাত দিয়েছি।

শাম্বের স্বেদসিক্ত কলেবরের কম্পন কিছু স্থির হলো। তিনি তাঁর নিজ

দেহের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করলেন, পিতা, তুই যদি সত্য তবে বলুন আমার আরোগ্যের উপায় কী?

কৃষ্ণ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, এখন আমি বুঝতে পারছি, মহর্ষি নারদকে তুমি রুষ্ট করেছো। তুমি তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাও নি। আমার মনে হয়, তোমার ব্যাধি প্রকটিত হলে তাঁর কাছেই তোমার যাওয়া উচিত। তিনি দেবভূমি থেকে সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন। বহু বিচিত্র স্থান ও সম্প্রদায়কে তিনি চাক্ষুষ করেছেন। একদিক থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের থেকে অনেক ব্যাপক। সম্ভবত তিনিও চান, তুমি তাঁরই দ্বারস্থ হবে। আমিও তোমাকে সেই উপদেশই দিচ্ছি, তুমি যথাসময়ে মহর্ষির সন্ধানেই যেও।

শাম্ব এখন অকম্পিত স্বরে ঘোষণা করলেন, পিতা, যা অমোঘ এবং অনিবার্য হয়ে জীবনে নেমে আসে, তাকে আমরা ভাগ্য বলে মানি। এই অভিশাপ আমার অদৃষ্ট। এই বয়সের মধ্যেই আমি ভাগ্যের উত্থানপতন কম দেখি নি। এককালে যদুবংশকে মহাবল সম্রাট জরাসন্ধ সংখ্যাল্প করেছিলেন, ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছিলেন। আজ কোথায় জরাসন্ধ। যদুবংশ সগৌরবে অবস্থান করছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অতি যুদ্ধার্থী কৌরবগণ প্রায় নিশ্চিহ্ন। পাণ্ডবেরাও লোকবলে ক্ষীণপ্রাপ্ত হয়েছেন। তথাপি কেউ নিশ্চেষ্ট বসে থাকেন নি। আমার ভাগ্যের এই অমোঘ অনিবার্য পরিণতি জেনেও, আমিও নিশ্চেষ্ট থাকবো না। প্রয়োজন হলে, মুক্তির জন্য আমি এই সসাগরা পৃথিবী, দেবলোকে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র যাবো। আমাকে আপনি বিদায় দিন।

শাম্ব পিতার পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকালেন। কৃষ্ণ শাম্বর মস্তক আঘ্রাণ করে মুখ ফিরিয়ে জাম্ববতীর দিকে তাকালেন। জাম্ববতী তখন অশ্রুজলে ভাসছিলেন। শাম্ব নিজে কাছে গিয়ে, মা জাম্ববতীকে প্রণাম করলেন। রুক্মিণী এবং সত্যভামাকেও প্রণাম করলেন। জাম্ববতী শাম্বর মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁকে শিশুর ন্যায় বক্ষে গ্রহণ করলেন। পুত্রস্পর্শে মায়ের স্তনধারা যেন সন্তানের জন্য অজস্র ধারায় বিগলিত হলো। তিনি অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললেন, বৎস, আশীর্বাদ করি, তুমি শাপমুক্ত হও। তোমার সেই জনচিত্তবিমোহিতকারী রূপ আবার লাভ কর।

অভিশাপ ভয়ে ভীতা ষোল সহস্র রমণীগণও এই দৃশ্য দেখে অশ্রুমোচন করলো। যে-কারণে তারা বাসুদেবের দ্বারা অভিশপ্ত, তাদের সেই রমণীচিত্ত শাম্বদর্শনে এখনো বিমোহিত। রূপবান পুরুষের প্রতি রমণীর চির আকাঙ্ক্ষা, এই অভিশাপের দ্বারাই চিরস্থায়ী হলো। শাম্ব প্রমোদকানন থেকে বিদায় নিলেন।

শাম্ব ফিরে এলেন নগরীতে। এখন তাঁর অঙ্গ স্বেদকম্পিত না। অভিশপ্ত পুরুষ এখন আত্মমগ্ন হয়ে, মুক্তির কথা ভাবছেন। গৃহ সন্নিকটে অদূরে রমণীয় কুঞ্জমধ্যে সহচরীরা তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি সেইদিকে ভগ্নহৃদয় বিষাদ দৃষ্টিতে দেখলেন। কিন্তু সেদিকে গেলেন না। যুদ্ধবিশারদ শাম্ব, রতিবিশারদ শাম্ব, আপন বাহু তুলে নিরীক্ষণ করলেন। সত্যি, তাঁর যে-অঙ্গে চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলই প্রতিবিম্বিত হয়, তা এখন অধিকতর রক্তাভ দেখাচ্ছে। তিনি গৃহমধ্যে গমন করলেন।

গৃহমধ্যে বহু দাসদাসী বিচরণ করছে। শাম্ব কারো প্রতি দৃষ্টিপাত না করে

অন্তঃপুরে গমন করলেন। সেখানে নানা সুবর্ণের আভরণ নানা সময়ে প্রাপ্ত বিবিধ মণি, কক্ষে কক্ষান্তরে, রমণীয় শয্যা ও বিবিধ গৃহসামগ্রী নানাদেশীয় মহার্ঘ বসন, কোনো কিছুর প্রতিই দৃষ্টিপাত করলেন না। অথচ এ সকলই ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

শাম্বকে অন্তঃপুরে গমন করতে দেখে রমণীগণ পাথর স্খলিত প্রস্রবণের ন্যায় সেদিকে ধাবিত হলেন। শাম্ব কপাট বন্ধ করে অতিকায় সুবর্ণদর্পণ হাতে তুলে নিলেন। নিরীক্ষণ করলেন আপন প্রতিবিম্বকে। আশ্চর্য, পিতা মিথ্যা কিছু বলেন নি। লক্ষ্য করে দেখলেন, তাঁর নাসা, কর্ণ, ভ্রূ ইত্যাদির স্থানে স্থানে স্ফীতিলাভ করেছে। এ কি বাসুদেবের অভিশাপমাত্রই ঘটলো? নাকি তাঁর কথায় এখন চোখে পড়ছে! তিনি কোষ্ঠীর ভবিতব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। হয় তো অভিশাপের বাস্তব ভিত্তি তাই। কিন্তু শাম্ব এই ঘটনাকে পিতার অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না।

শাম্ব সুবর্ণদর্পণ রেখে দিয়ে কপাট খুলে দিলেন। রমণীগণ মধ্যে কেবল লক্ষ্মণাকেই প্রবেশ করতে বললেন। এই সেই দুর্যোধন আত্মজা লক্ষ্মণা, যাঁকে শাম্ব হরণ করে বিবাহ করেছিলেন। লক্ষ্মণা সর্বাঙ্গসুন্দরী, সর্বালঙ্কার-শোভিতা। কিন্তু শাম্ব কর্তৃক সখী ও সহচরীদের কক্ষ প্রবেশে বাধাদানে অবাক হলেন। অবাক হলো প্রণয়সঙ্গিনীরা। ম্লান মুখে তারা ফিরে গেল। লক্ষ্মণার হৃদয় অশুভ আশংকায় কেঁপে উঠলো। তিনি শংকিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার। তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

শাম্ব ব্যস্ত কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে লক্ষ্মণা?'

লক্ষ্মণা প্রশ্ন আশা করেন নি। শাম্বর জিজ্ঞাসায় এক মুহূর্ত দ্বিধাগ্রস্ত হলেন, তারপর বললেন, 'তোমার চোখ মুখ শুষ্ক। পীড়িত, বিষণ্ণ, দুঃখিত দেখাচ্ছে তোমাকে। মহর্ষি নারদ তোমাকে কোথায় ডেকে নিয়ে গেছলেন? কিছুক্ষণ আগেও তুমি সুখী ছিলে। এখন এত করুণ আর বিমর্ষ কেন?'

শাম্ব লক্ষ্মণাকে সব কথাই বললেন। লক্ষ্মণা অস্ফুট ক্রন্দনে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'অভিশাপ! কেন? তুমি যে রমণীমোহন, এ কথা দ্বারকায় সর্বজনবিদিত। তবে কেন অভিশাপ?'

শাম্ব বললেন, 'লক্ষ্মণা, অভিশাপ জিজ্ঞাসার অতীত। এ অমোঘ এবং অনিবার্য। এ ভাগ্যের পরিহাস না, নির্দেশ। একে অমান্য করা চলে না। আমি এখন থেকে তোমাদের কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবো। নগর প্রাকারের বাইরে কিছুকাল অপেক্ষা করে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর নির্দেশ নেবো। তিনি যা বলবেন তাই করবো।'

লক্ষ্মণা আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হয়ে উঠলেন, বললেন, 'না না, আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না। তুমি যেখানেই যাও আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

শাম্ব শান্ত স্বরে বললেন, 'লক্ষ্মণা, মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই একমাত্র এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। তিনি যদি নির্দেশ দেন, তা হলে তুমি আমার সঙ্গে যাবে। তবে, খুব দ্রুতই ব্যাধি আমাকে গ্রাস করবে, আমি অনুভব করছি। পূর্ণ গ্রাসের পূর্ব পর্যন্ত আমি নগরের বাইরে থাকবো। তারপরে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।'

লক্ষ্মণার কান্না হৃদয়বিদারক হলো। তিনি শাম্বকে আলিঙ্গন করে তাঁর

প্রতিটি অঙ্গ নিরীক্ষণ করে সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, 'প্রিয়তম, সুবর্ণ-দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল তোমার অঙ্গে, আমি কিছুমাত্র পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম দেখি না। এ সকলই তোমার পিতার অভিশাপগ্রস্ত মনের ও চোখের বিকার। আমি এখনো তোমার বুকে আমার প্রতিবিম্বকে দেখতে পাচ্ছি। তুমি এখনো বিশ্বের সকল পুরুষের ঈর্ষণীয় সেই বলিষ্ঠ রূপবান পুরুষই আছো। পিতার অভিশাপ পুত্রের প্রতি স্নেহেরই এক বিপরীত সম্ভাষণ। ব্যাধির আশংকা, গৃহ-ত্যাগের বাসনা তুমি মন থেকে ত্যাগ করো।'

শাম্ব মনে মনে হাসলেন, করুণ আর মর্মান্তিক সেই হাসি। বললেন, 'লক্ষ্মণা, পিতার অভিশাপ না, বৃষ্ণিসিংহাবতার পুরুষের অপমানিত মর্মাহত অন্তরের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে আর এক পুরুষের প্রতি। এ ক্ষেত্রে পিতা পুত্রের সম্পর্কজনিত কপট উষ্মা বা ক্রোধের বিষয় কিছু নেই। তোমাকে তো সব ঘটনাই বললাম। বাসুদেবের মতো ব্যক্তির পৌরুষে যদি আঘাত লাগে, তবে তাঁর সংহার-মূর্তি কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, তুমি কল্পনা করতে পারো! অন্য পুরুষের তো কোনো কথাই নেই। তা ছাড়া, তুমি আমার মনের ও চোখের যে-বিকারের কথা ভাবছো, তা সত্যি না। পিতা কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। আমি কখনোই নিজেকে দেখতে ভুল করি নি। বিকার বা মায়া, কিছুই আমাকে গ্রাস করে নি। পিতার ষোল সহস্র রমণীর প্রমত্ত উৎকট কামতাড়িত আচরণ আমি নিজেই লক্ষ করেছি। বৃষ্ণিসিংহের ক্রোধবহ্নির সম্যক কারণ আমি অনুভব করেছি।'

লক্ষ্মণার আসন্ন স্বামী-বিচ্ছেদ-কাতর প্রাণ কোনো যুক্তি মানতে পারছে না। অশ্রুসজল চোখে, ব্যথায়, অভিমান স্ফুরিত স্বরে বললেন, 'রতিকোশাস্ত্রবিদ হে দ্বারকামোহন, সেই রমণীদের কামোচ্ছ্বসিত আচরণের অপরাধই বা কী? আমি জানি তুমি কদাচ সেই রমণীদের নিজের রূপের দ্বারা কামোদ্রেক করো নি। কিন্তু সর্বজ্ঞ বৃষ্ণিসিংহ কি জানতেন না, মাতৃগণ ব্যতীত দ্বারকার সকল রমণীকুলের তুমি অতি আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ? এই ষোল হাজার রমণীকে নির্বিচারে গ্রহণের জন্য তিনি নিজেকে অনাচারীজ্ঞানে অতি পুণ্যের স্যমন্তক মণি ধারণ করতে পারেন নি। মুষল ও লাঙ্গলধারী দুর্দান্ত যদুবীর বলভদ্রকেও তিনি সেই স্যমন্তক মণি ধারণ করতে দেন নি, কারণ বলভদ্রও সর্বদাই সুরাসবপানে প্রমত্ত থাকেন। তবে তোমাকে কেন তিনি কামোচ্ছ্বসিত রমণীদের কারণে অভিশাপ দিলেন?'

শাম্ব গম্ভীর হলেন, বললেন, 'লক্ষ্মণা, সুলক্ষণে প্রিয়তমে, তোমাকে আগেই বলেছি মহাপুরুষের অভিসম্পাত প্রশ্নের অতীত। তা ছাড়া যদুকুলের কুমারগণ তাঁদের পিতার সমালোচনা শুনতে অভ্যস্ত না। পিতার অভিশাপ অলঙ্ঘনীয়। তিনি আমাকে মুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। এখন সেই পথেই আমার যাত্রা।'

লক্ষ্মণা ক্রন্দনোচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, 'আহ্, হায় কী দুর্ভাগ্য আমার, যে-পুরুষের মুহূর্তের দর্শন ছাড়া থাকতে পারি না, যিনি আমাকে হরণ করার সময়ে পিতার বাধা দানের ফলে হস্তিনানগরী ভূমিকম্পে আকুণ্ঠিত হয়েছিল, যাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়ে ছাড়া দিনযাপন করি নি, তিনি পিতার দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে আজ আমাকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন।'

শাম্ব লক্ষ্মণাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মণা, অভিশাপমুক্ত হয়ে আমি আবার ফিরে আসবো।'

রমণীর মন এই সব সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ মানে না। শাম্বর দেহলগ্ন হয়ে

তিনি নানা রূপে নিজের ব্যথা প্রকাশ করতে লাগলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি নগর প্রাকারের বাইরে কেন যাবে?'

শাম্বর বিশাল বক্ষ দীর্ঘশ্বাসে ভারি হয়ে উঠলো। কিন্তু কাতরতা প্রকাশ না করে বললেন, 'লক্ষ্মণা, ব্যাধি আমাকে পূর্ণরূপে গ্রাস করবার আগেই আমি আমার প্রিয়জনদের লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে চাই।'

লক্ষ্মণা এই কথা শুনে অতি শোকাকুলা হলেন। কারণ তিনি এই বলীয়ান রূপবান পুরুষের অন্তরের বেদনা অনুভব করলেন। যিনি নগরের পথে বের হলে রমণীগণ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে দেখতে ছুটে আসেন, তিনি কুৎসিত বিকলাঙ্গ দেহ নিয়ে কেমন করে সেই নগরী মধ্যে বাস করবেন? তখন লক্ষ্মণা স্বামী সান্নিধ্যে বসনভূষণ পরিত্যাগ করে, যুগপৎ কান্না ও আবেগকম্পিত স্বরে বললেন, 'হে পরম সুন্দর মহাভুজ রমণীবিশারদ, এই দারুণ দুঃখেও আমি অতিপ্রার্থিনী হয়ে তোমাকে কামনা করছি। তোমার দুই বিশাল বাহু ও বক্ষ ও তেজ দ্বারা আমাকে মর্দিত করো।'

শাম্ব শান্ত ও অবিকৃতভাবে লক্ষ্মণাকে আপন অঙ্গে গ্রহণ করলেন। কিন্তু মনে মনে বললেন, 'হায় অভিশাপ! কুরুকুলের এই অবিস্মরণীয় রমণীরত্নের সঙ্গে সঙ্গম প্রমোদেও কোনো সুখানুভূতির লেশ নেই। জীবনপ্রবাহ কি আশ্চর্য স্বপ্নবৎ! যে-আত্মা অতি দুর্জ্ঞেয়, সেই আত্মানুসন্ধানেই জীবনকে আহরণ করতে হয়। আমার সমগ্র ধারণা এখন এই ধারণার বশবর্তী।...'

শাম্বর নগর প্রাকারের বাইরে সকলের চোখের অন্তরালে সমুদ্রোপকূলবর্তী বালুবেলায়, বৎসরান্ত বাসের আগেই, পিতার অভিশাপ এবং ভবিতব্য সমগ্র দেহে অতি উৎকটরূপে প্রকটিত হলো। তিনি দিনের আলোয় সচরাচর বালুবেলায় আত্মপ্রকাশ করতেন না। উপকূলবর্তী পর্বতের গুহাকন্দরে দিনযাপন করতেন। পর্বতের বুকে, আশেপাশের বৃক্ষে ও ভগ্নপ্রস্তর মৃত্তিকায় যে সমস্ত ফলমূলাদি সংগ্রহ করতে পারতেন তা দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন। পর্বতের ক্ষীণ প্রস্রবণ-ধারায় যে মিষ্ট জল পেতেন, তা দিয়ে তৃষ্ণা মেটাতেন।

নগররক্ষীরা যখন অশ্বচালনা করে, নগরের বাইরে টহল দিতে বেরোতো, শাম্ব কখনোই তাদের সামনে যেতেন না। সূর্যাস্তের পর তিনি যখন বালুবেলায় বেরিয়ে আসতেন তখন নগরের দ্বারপালদের ঘন্টাধ্বনি শুনতে পেতেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো, রৈবতক পর্বত নগরীর আলোকমালা। নাগরীদের গুঞ্জন ও হাসি, নাগর পুরুষদের দেখে, চোখের ঝিলিক হানা নানা প্রকারের অঙ্গভঙ্গি। সুরাসবপানে সুখী ও প্রমত্ত রাজপুরুষগণের নাগরী পণ্যাঙ্গনাদের অতি রুচিশীল সঙ্গীত ও নৃত্য মুখরিত অঙ্গনে গমন। প্রবাসী ইন্দ্রপ্রস্থবাসী বা পাঞ্চালের অধিবাসীরা বা অন্যান্য দেশের নাগরিকগণ, দ্বারকানগরীর নৈশ প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে, মঙ্গল শঙ্খ ও ঘন্টা বাজছে। শাম্ব শুনতে পেতেন সবই। দূরের অন্ধকার বালুবেলা থেকে দেখতে পেতেন না কিছুই। কিন্তু সবই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো।

শাম্বর নিজের গৃহাঙ্গনে ও অন্তঃপুরের কী অবস্থা? তিনি নির্বিকার থাকবার চেষ্টা করলেও সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতোই সে-সব বিষয় তাঁর অন্তর মধ্যে তরঙ্গায়িত হতো। তাঁর গৃহাঙ্গনে ও অন্তঃপুরে আলো জ্বলছে তো?

রমণীরা প্রতি রাত্রের মতোই সুখে বিচরণ করছে তো? লক্ষ্মণা অন্ধকারে মুখ ঢেকে বসে নেই তো? মাতৃগণ মনোকষ্টে নেই তো? পিতা বিচলিত ও বিমর্ষ হয়ে নেই তো? ভ্রাতা ও বন্ধুগণ তাঁর অদর্শনে ভগ্নমনোরথ হয়ে নেই তো?

এই ভাবে বৎসর পূর্তির পূর্বেই শাম্বর দেহ কুষ্ঠরোগের গ্রাসে অতি কুৎসিত ও বিকলাংগ রূপ ধারণ করলো। পিতার নির্দেশ তাঁর মনে পড়লো। মহর্ষি নারদের কাছে তাঁকে যেতে হবে। তাঁর কাছে যাবার সময় হয়েছে। তিনিই ব্যাধি-মুক্তির উপায় বলে দেবেন। কিন্তু তিনি এখন কোথায়? শাম্ব তাঁকে কোথায় পাবেন? মহর্ষি সর্বব্যাপী। ঋষিগণসহ নানা বর্ষগুলোতে পরিভ্রমণ করে বেড়ান। অথচ তাঁকে না পেলে চলবে না। তাঁর প্রতি অসংগত আচরণের মূলেই নিহিত রয়েছে এই অভিশাপের কারণ। সেইজন্য হয়তো পিতা তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করে মুক্তির উপায় জানতে বলেছেন।

শাম্বর সহসা মনে হলো, পিতার কাছে যাওয়া উচিত। একমাত্র তিনিই হয়তো বলতে পারেন মহর্ষি এখন কোথায় অবস্থান করছেন। রাত্রে তিনি এই কথা ভাবলেন এবং পরের দিন প্রভাতেই নগরদ্বার উন্মুক্ত হবার পরে নগরের উদ্দেশে গমন করলেন। না, এখন আর শাম্বকে দেখে কেউ যদুবংশের সেই রূপবান যুদ্ধবিশারদ পুরুষকে চিনতে পারবে না। নগর ও দ্বাররক্ষীরা সহজেই অনুমান করে নেবে, তিনিও একজন ব্যাধিগ্রস্ত অসহায় ভিক্ষার্থী। ভিক্ষা শেষে যথাসময়ে নগরের বাইরে নিজের আশ্রয়ে চলে যাবেন।

শাম্ব ভুল ভাবেন নি। দ্বাররক্ষীরা তাঁর দিকে কৃপাদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেদের বিশাল গুম্ফে মোচড় দিল। কেউ তাঁকে বাধা দিল না। নানা কার্যব্যপদেশে, নগরের অধিবাসীরা পথে ভিড় করে, নানা কথায় মুখরিত করে চলেছেন। কেউ শাম্বর কুষ্ঠ কুৎসিত চেহারার দিকে ফিরেও তাকালেন না। বরং কেউ কেউ যুগপৎ ঘৃণা ও কৃপাবশে, তাঁর প্রতি দূর থেকে মুদ্রাদি নিক্ষেপ করলেন এবং শাম্বকে তা সাগ্রহে সংগ্রহ না করতে দেখে তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

শাম্ব দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করে রৈবতকে কুশস্থলীতে গমন করলেন। বিভিন্ন স্থানে চারুদেষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি ইত্যাদি ইত্যাদি যাদবশ্রেষ্ঠগণকে দেখতে পেলেন। তাঁরা কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না, তাঁর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাতও করলেন না। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি অনায়াসেই বাসুদেবের সাক্ষাৎ পেলেন, এবং অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি দৃষ্টিপাতমাত্র পুত্রকে চিনতে পারলেন। তাঁর অভিশাপের জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বরূপ শাম্বর কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত মূর্তি দেখে কৃষ্ণ মুহূর্ত মধ্যে অত্যন্ত বিচলিত ও বিষণ্ণ হলেন। সেই মুহূর্তে গান্ধারীর অভিশাপের কথা তাঁর মনে পড়লো। গান্ধারী শোকে ও মনস্তাপে অতীত বিস্মৃত হয়েছিলেন। যুদ্ধের পূর্বে তাঁর পুত্রের আস্ফালন, যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলা, কৃষ্ণের বহু অনুরোধ, যুদ্ধজনিত জ্ঞাতি ও লোকক্ষয় বিষয়ে কৃষ্ণের সাবধানবাণী, শান্তি ও সম্প্রীতি বিষয়ে কৃষ্ণের দৌত্য সে-সবই তখন শোকাকুলা গান্ধারী বিস্মৃত হয়ে কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ জানতেন, কালের অমোঘ নিয়মে যা অনিবার্য গান্ধারী অভিশাপ দিতে গিয়ে সে-কথাই উচ্চারণ করেছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি তা কখনোই অভিশাপরূপে বর্ষিত হয় নি।

কিন্তু এখন কৃষ্ণ নিজ মুখে উচ্চারিত অভিশাপেরই পরিণতি, কুষ্ঠ জর্জরিত আত্মজকে দেখে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করলেন। তিনি শাম্বকে নিয়ে কুশস্থলীর

এক কক্ষে দ্রুত গমন করলেন। শাম্ব পিতাকে যথাবিহিত প্রণাম ও পাদার্ঘ প্রদান করে বললেন, 'পিতা, আপনার মনে কোনো প্রকার দুঃখ সঞ্চার করতে বা আপনাকে বিচলিত করতে আমি আসি নি। আপনার অভিশাপে আমার সর্বাংগে ব্যাধি। আপনি বলেছিলেন, আরোগ্যলাভের উপায় একমাত্র মহর্ষি নারদ আমাকে বলতে পারবেন। কিন্তু তিনি এখন কোথায় আছেন, আমি জানি না। তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে চাই।'

কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য ও চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'শাম্ব, এ বিচিত্র যোগাযোগ! মহর্ষি আজই দ্বারকায় এসে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। তাঁকে আমি এখনই তোমার সংবাদ দিচ্ছি, তুমি অপেক্ষা করো।'

শাম্বও মনে মনে বিস্ময় ও স্বস্তি বোধ করলেন। বললেন, 'এ আমার এক পরম সৌভাগ্য!'

কৃষ্ণ কক্ষত্যাগ করে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং ক্ষণপরেই মহর্ষি নারদসহ, সেখানে আবার উপস্থিত হলেন। মহর্ষি নারদকে দেখে শাম্ব এগিয়ে এসে কষ্টের সংগে নতজানু হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। মহর্ষি আশীর্বাণী ও স্বস্তিবচন উচ্চারণ করে, কৃষ্ণের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি শাম্বর ব্যাধিমুক্তি বিষয়ে আলোচনা করবো।'

কৃষ্ণ মহর্ষির ইংগিত উপলব্ধি করে সে-স্থান ত্যাগ করলেন। মহর্ষি শাম্বকে বললেন, 'বসো, আমি তোমাকে এক স্থানের কথা বলবো।'

মহর্ষি অগ্রে আসন গ্রহণ করলেন। শাম্ব অদূরে উপবেশন করলেন। বললেন, 'হে পরমপূজনীয় মহর্ষি, আমার বিষয়ে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই। নিতান্ত চপলতাবশত আমি আপনার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করেছিলাম, কিন্তু আপনি অনুমান করতে পারেন, যদুবংশের পুত্র হয়ে আমি কখনোই ইচ্ছাকৃতভাবে তা করি নি। এখন যা অনিবার্য তাই ঘটেছে। পিতার দ্বারা আমি অভিশপ্ত হয়ে কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত। আপনি তুষ্ট হোন, আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনি সুরলোক, অসুরলোক, গন্ধর্বলোক অন্তরীক্ষ যাবতীয় লোকে গমনাগমন করে থাকেন। আপনার অভিজ্ঞতা সীমাহীন। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে উপদেশ দিন এখন আমার কী কর্তব্য? পিতা বলেছেন, আপনি আমার আরোগ্যলাভের উপায় বলে দিতে পারেন।'

মহর্ষি শাম্বর কথা শুনলেন, তারপরে সম্বোধন করলেন, 'হে বৃষ্ণিব্যাঘ্র! তোমার প্রতি আমার পরম সন্তোষ জ্ঞাপন করছি।'

মহর্ষির মুখে 'বৃষ্ণিব্যাঘ্র' সম্বোধন শুনে, শাম্বর প্রাণের মধ্যে অতি ব্যথাতুর একটি আনন্দানুভূতি হলো। মনে হলো, এখনই তাঁর পুচ্ছহীন রক্তগর্ভ চোখ জলপূর্ণ হয়ে উঠবে। তিনি হৃদয়ের আবেগকে দমন করে মহর্ষির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

মহর্ষি আবার বললেন, 'আমি জানি, তোমাকে অতি কষ্টের মধ্য দিয়ে কালযাপন করতে হবে। কিন্তু তার কিছুই বৃথা যাবে না। এবার মন দিয়ে শোন। আমি একদা একবার সূর্যলোকে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি, সূর্যদেবকে দেবতারা বেষ্টন করে আছেন। দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাবৃন্দ তাঁর চারপাশে অবস্থান করছেন। ঋষিগণ সেখানে বেদপাঠ করছেন এবং সূর্যের স্তব করছেন, পূজিত হচ্ছেন ত্রিসন্ধ্যা দ্বারা। সেখানে সূর্যকে ঘিরে রয়েছেন আদিত্যগণ, বসুগণ, মারুতগণ, অশ্বিনীগণ। তাঁর পার্শ্বেই রয়েছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র তাঁর দুই পত্নী রজনী ও নিক্ষুভা। রয়েছেন পিঙ্গলা, যিনি সদাসর্বদা মঙ্গল

অমঙ্গল বিষয়ে লিখে চলেছেন। দ্বারপাল রূপে রয়েছেন দন্ডনায়ক, রজনা, স্তোশা, কালমাস এবং পক্ষী। কথশৃঙ্গে রয়েছেন ভিওমন এবং নগ্নদীদ্দিন্ড।'

শাম্ব স্তব্ধ বিস্ময়ে মহর্ষির মুখ থেকে এই বর্ণনা শুনলেন। মহর্ষি আবার বললেন, 'ইনি একমাত্র অনাবৃত দর্শিত ঈশ্বর, যিনি সকল দেবতা ও পিতৃগণেরও ঊর্ধ্বে। ইনিই সকল শক্তির উৎস। ইনি বিশ্বের রক্ষাকর্তা ও নিয়ন্তা, ইনিই স্রষ্টা ও সময়ে ধ্বংসকারী। তোমার একমাত্র পূজ্য দেবতা এই সূর্য। ইনি সমস্ত অমঙ্গল ও ব্যাধিকে ধ্বংস করেন, সেই জন্য সকল দেবতাগণ তাঁকে মান্য করেন। তুমি সেই সূর্যলোকে যাও।'

শাম্ব বিনীত নম্রস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কখনো এই সূর্যলোকের কথা শুনি নি। আপনার অশেষ করুণা, আপনি আমাকে শোনালেন। কিন্তু কোথায় এই সূর্যলোকের অবস্থান, আমি তাও জানি না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পথের সন্ধান দিন, আমি যে-কোনো প্রকার নিগ্রহ সহ্য করে তাঁর করুণাভিক্ষা করতে সেখানে যাবো।'

মহর্ষি বললেন, 'যথার্থ বলেছ। তুমি এখান থেকে উত্তর সমুদ্রতীরে গিয়ে, উত্তর পূর্বে গমন কর। তুমি যাবে মহানদী চন্দ্রভাগা তীরে, সেখানে মিত্রবনে সূর্যক্ষেত্র বর্তমান। সেখানে তিনি পরমাত্মা রূপে অত্যুজ্জ্বল পুরুষ রূপ নিয়ে রয়েছেন। তুমি সেইখানে গমন করো।' এই কথা বলে, মহর্ষি গাত্রোত্থান করে আবার বললেন, 'কোনো কারণে কোনো সংকটে পড়লে, তুমি আমার সন্ধান করো, আমি তোমার সংকটমোচনের উপায় বলবো।'

শাম্ব করজোড়ে নতজানু হয়ে আবার মহর্ষির পদধূলি গ্রহণ করলেন। মহর্ষি চলে যাবার কিছু পরেই কৃষ্ণ এলেন। মহর্ষি শাম্বকে কোনো কথা পিতাকে বলতেই নিষেধ করেন নি। অতএব তিনি মহর্ষি বর্ণিত মহানদী চন্দ্রভাগা তীরে সূর্যক্ষেত্র মিত্রবনের কথা পিতাকে বললেন, এবং তখনই যাত্রা করার জন্য পিতার অনুমতি চাইলেন।

কৃষ্ণ বললেন, 'একমাত্র মহর্ষিই এ বিষয়ে অবগত আছেন। চন্দ্রভাগা মহানদী দেবলোক থেকে অতি বেগে প্রবাহিত হচ্ছে, আমি জানি। কিন্তু সূর্যক্ষেত্র মিত্রবনের সন্ধান আমার জানা নেই।'

শাম্ব বললেন, 'মহর্ষি আমাকে পথের নির্দেশ দিয়েছেন। যথাস্থানে পৌঁছুতে আমার কতোদিন লাগবে, তা আমি জানি না। অতএব যতো শীঘ্র সম্ভব, আমি যাত্রা করতে ইচ্ছুক। আপনি আমাকে বিদায় দিন।' এই বলে তিনি নতজানু হয়ে পিতার পদযুগল স্পর্শ করে মাথায় ঠেকালেন।

পুরুষোত্তমের অন্তর বিচলিত হলো। তিনি তাঁর ঔরসজাত সেই অত্যুজ্জ্বল রূপবান বংশধরের দিকে করুণ চোখে তাকালেন। দেখলেন, তাঁর নাসিকা মধ্যস্থল দুই গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভগ্ন। তাঁর ভ্রূযুগল কেশহীন, সমস্ত মুখমণ্ডল মলিন কালিমালিপ্ত এবং তাম্রাভ, কোথাও রক্তাভ শুষ্ক ঘা এবং অতি পলিত। বিশাল চক্ষুদ্বয়ের কৃষ্ণপুচ্ছ সকল পতিত হয়েছে, ফলে চোখ অতি রক্তাভ দগদগে দেখাচ্ছে। তাঁর সমগ্র দেহের চর্ম স্ফীত, বিবর্ণ, হাত পা বিকলাঙ্গের ন্যায়। কেবলমাত্র চোখের দৃষ্টি অতি করুণ অসহায়। কৃষ্ণ বললেন, 'এই দূর পথের যাত্রায় তুমি কী কী গ্রহণযোগ্য মনে করো।'

শাম্ব বললেন, 'কিছুই না। আমি অভিশপ্ত, মুক্তির সন্ধান ছাড়া কিছুই আমার গ্রহণীয় না।'

কৃষ্ণ বললেন, 'এত দূরবর্তী পথ তুমি অশ্বচালিত রথ অথবা অশ্বারোহণ ব্যতিরেকে কেমন করে যাবে? ক্ষুধা তৃষ্ণা ছাড়াও পথ চলতে আরো নানা রকমের প্রয়োজন থাকে।'

শাম্ব বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'এখন আর আমার সে-সবে কোনো প্রয়োজন নেই। কবচ কুণ্ডল অঙ্গুরীয়াদি সবই আমি খুলে রেখেছি। সর্বাঙ্গে জড়াবার বস্ত্র আমার আছে। এমন কি পাদুকাও আমি ত্যাগ করেছি, কারণ পাদুকা পায়ে চলতে পারি না। আমার এই বিকট মূর্তি নিয়ে এখন রথারোহণ, গ্রাম জনপদে বিস্ময় ও অবিশ্বাস উৎপাদন করবে। অশ্বারোহণে গেলে, লোকে আমাকে নানা প্রকার ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবে। এখন আমাকে ওসবে খুবই বেমানান লাগবে। সপারিষদ অথবা সৈন্যসামন্তসহ আমি যেতে পারি না। আমার এ যাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যাধিগ্রস্ত হতদরিদ্র লোকেরা যেমন অন্যান্যদের সাহায্যে বা কৃপায় গ্রাম-জনপদে গমনাগমন করে থাকে, আমাকেও সেইভাবেই যেতে হবে। ক্ষুধা তৃষ্ণা? ভাববেন না। গাছে ও মাটিতে ফলমূলের অভাব হবে না। তৃষ্ণার জলও নদনদী জলাশয় প্রস্রবণ থেকে সংগ্রহ করতে পারবো। আপনি কোনোরকম দুশ্চিন্তা করবেন না।' শাম্ব পিতার সামনে আর উচ্চারণ করবেন নাঃ তিনি একজন অভিশপ্ত মানুষ। পূর্ব জীবনের সঙ্গে এখন তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি আর এখন যদুবংশের রূপবান কুমার নেই। গ্রামজনপদের ভিক্ষান্নে তিনি দিন যাপন করতে পারবেন।

কৃষ্ণ নিজেও যে সে-কথা বোঝেন না, এমন নয়। তবু আত্মজর কথা শুনে, কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলেন। তার পরে বললেন, 'তোমার গর্ভধারিণীর সঙ্গে দেখা করবে না?'

শাম্বর চোখের সামনে মাতৃমূর্তি জাম্ববতী ভেসে উঠলেন। পুত্র দর্শনে তাঁর খুশী মুখের আকস্মিক আহত আঘাতপ্রাপ্ত অভিব্যক্তি যেন শাম্ব দেখতে পেলেন। বললেন, 'আমি আপনার কাছ থেকেই অনুমতি নিয়ে যাত্রা করছি। মাতৃগণকে আপনিই সমস্ত বৃত্তান্ত বলবেন, আমার প্রণাম জানাবেন। আপনি আমাকে যাত্রার অনুমতি দিন।'

কৃষ্ণ বললেন, 'এসো। তোমার যাত্রা সফল হোক।'

শাম্ব আর একবার পিতার পদধূলি নিয়ে যাত্রা করলেন। লক্ষ্মণার কথা কি তাঁর মনে পড়ছে না? তাঁর নিজের অন্তঃপুর, বিলাস সামগ্রীতে সাজানো গৃহের সৌন্দর্য, রমণীরত্নাদি, যাদের সঙ্গে নানা ক্রীড়া কৌতুকে, ভোগে বিলাসে দিনগুলো কেটে যেতো, সে-সব কিছুই কি তাঁর মনে পড়ছে না? কোনো মানুষের পক্ষেই সে-সব ভোলা সম্ভব না। কিন্তু অভিশাপমুক্ত না হয়ে শাম্ব আর সেখানে তাদের সামনে যাবেন না। শাম্বকে দেখলে এখন তাদের দৃষ্টি আহত, বিস্ময়ে ও ঘৃণায় কুঞ্চিত হবে। চিত্তবিকার ঘটবে। লক্ষ্মণারও কি একই অবস্থা হবে না?

শাম্ব কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে দ্রুত নগরীর পথে বেরিয়ে পড়লেন। রৌদ্রকরোজ্জ্বল নগরীর পথে পথে নগরবাসীরা চলাচল করছে। যদুবংশের বালক এবং কুমারগণ অশ্বারোহণে নানা দিকে ভ্রমণ করছে। নগররক্ষীদের এই শান্তির সময়ে তেমন ব্যস্ততা নেই। নানা শ্রেণীর শ্রমজীবী ও অন্যান্যদের সঙ্গে ওরাও, পথিমধ্যে শুণ্ডিনীর ভাণ্ডারের সামনে মক্ষিকার ন্যায় জড়ো হয়েছে। সকলের দৃষ্টি যে কেবল শুণ্ডিনীর পৈষ্ঠী ও মাধ্বীপূর্ণ পাত্রের দিকে, এমন বলা যায় না। রসিকা যুবতী শুণ্ডিনীর প্রতিও অনেকের লক্ষ্য। তার অবিশ্যি কেউ পর না,

সবাই আপন। সে সবাইকেই তার হাসির দ্বারা আপ্যায়ন করছে, সবাইকেই দৃষ্টির ঝলক হানছে, এবং সবাইকেই তার সুঠাম অঙ্গের নানা ভঙ্গি দ্বারা জানিয়ে দিচ্ছে, তার তৈরি সুরাপানে সকলেই কেমন উল্লাস বোধ করে থাকে।

শাম্ব নগরীর প্রাসাদসমূহের অলিন্দে ও গবাক্ষে রমণীদের কারোকে অলস-ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। যদুবংশের কুমারগণকে কেউ কেউ কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করছে এবং একে অপরকে অঙ্গুলিদ্বারা বিশেষ কারোকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে হাস্যপরিহাস করছে। শাম্বকে তারা কেউ চিনতে পারছে না। একজন কুষ্ঠরোগীর প্রতি তাকিয়ে, কেউ তার দৃষ্টিকে অকারণ বিঘ্নিত করতে চায় না।

শাম্ব অকারণ অতীতের কথা ভেবে, মনস্তাপ ভোগ করতে চান না। কারণ সে-মনস্তাপের কোনো মূল্য নেই। তিনি দ্বারকার নানা পথ দিয়ে, পূর্ব দিকের প্রধান দ্বারের দিকে এগিয়ে চললেন। যদিও আগের মতো স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে চলতে তিনি আর সক্ষম নন। তাঁর সর্বাঙ্গের বহিরঙ্গ এখন প্রায় সম্পূর্ণ অসাড়। হাত ও পায়ের গ্রন্থিসমূহে রক্তাভ ক্ষত ও স্ফীতির জন্য পদক্ষেপ সহজ নেই। সহসা দ্রুতগতি অশ্বচালিত রথ অথবা কোনো অশ্বারোহী দ্রুতবেগে ছুটে এলে, তিনি অনায়াসে পথের পাশে ছিটকে চলে যেতে পারেন না। স্বভাবতই রথারোহী ও অশ্বারূঢ় ব্যক্তিগণ বিরক্ত হন। এই নগরীর পথও সর্বত্র মোটেই সমতল না। সমুদ্রমধ্যে পার্বত্যদ্বীপ বিশিষ্ট এই ভূমির অধিকাংশ রাজপথই চড়াই উৎরাইয়ে বন্ধুর।

শাম্ব মনে মনে পুণ্যভূমি মিত্রবনের কল্পনা করতে করতে, ব্যাধির দুঃখ কষ্ট ভোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রায় দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত করে তিনি নগরীর পূর্ব দ্বারে পৌঁছুলেন। এই সময়ে যদুবংশের কুল-রমণীগণ সর্বালঙ্কার শোভিতা হয়ে সহচরীদের সঙ্গে কোনো পূজা সাঙ্গ করে ফিরছিলেন। উপবাসক্লিষ্ট হলেও পূজাশেষে তাঁদের মন প্রফুল্ল ছিল। তাঁরা দরিদ্র ও প্রার্থীদের পথে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করতে করতে যাচ্ছিলেন। শাম্বও ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনি হাত না পেতে পারলেন না। পূজারিণীরা তাঁকে বিমুখ করলেন না, কিন্তু তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতে সকলেই আকুঞ্চিত মুখে শিহরিত হচ্ছিলেন। স্পর্শের আশংকায় দূর থেকে মিষ্টান্ন নিক্ষেপ করছিলেন।

শাম্ব দুঃখ ও মনস্তাপ থেকে নিজেকে নির্বিকার রাখলেন। মনে মনে কেবল উচ্চারণ করলেন, "আমি অভিশপ্ত।" তিনি পূজারিণীদের আচরণে কোনো দোষ খুঁজে পেলেন না। এরকম না ঘটলেই তিনি বরং অবাক হতেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা, জবাব পাচ্ছেন, তাঁর দৃষ্টি ও মন এই সব রমণীদের তুলনায় উদার ছিল না। অতীতে সুস্থাবস্থায় কুষ্ঠরোগীর বীভৎস চেহারা দেখে, তাঁর মনেও বিকার ঘটতো, দৃষ্টি আহত ঘৃণায় শিহরিত হতো এবং সংস্পর্শ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতেন।

শাম্ব ফল ও মিষ্টান্ন খেয়ে, পথের ধারে জলাশয়ে সকলের কছ থেকে দূরে জলপান করলেন। সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট নৌকায় আরোহণ করে, মূল ভূখণ্ডে পৌঁছুলেন। অবিশ্যি সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট নৌকোয়ও তাঁকে যাত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হলো। স্বভাবতই তাঁর মতো একজন ব্যাধিগ্রস্তের কাছ থেকে খেয়া-পারানির অর্থ কেউ দাবি করে নি।

মূল ভূখণ্ডে পৌঁছুতে অপরাহ্ণ হয়ে গেল। যাত্রীরা দলবদ্ধ হয়ে যে-যার পথে চলে গেল। শাম্ব সমুদ্রের তীর ধরে উত্তর দিকে চলতে লাগলেন। কোন্ সীমানা থেকে পূর্ব-উত্তরে গমন করতে হবে, মহর্ষি নারদ স্থির করে তা বলে দেন নি। অধিক উত্তরে সিন্ধুদেশ কুবলয়াশ্ব বংশধরদের রাজত্ব। ভূমিকম্পপ্রবণ সেই দেশে ঋষি উতংকের আশ্রম ছিল। শাম্ব অনুমান করলেন, সমুদ্রতীর ধরে ততোধিক উত্তরে তাঁকে যেতে হবে না।

আকাশ ক্রমে রক্তাভ হলো, এবং অতি দ্রুত সেই রক্তাভায় কৃষ্ণছায়া ছড়িয়ে পড়ে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে লাগলো। বহু দূর দিগন্ত পর্যন্ত বালুকারাশি এখনো তপ্ত। শাম্বর অশক্ত পদযুগল প্রতি পদক্ষেপেই সেই তপ্ত বালুতে ডুবে যাচ্ছে। গতি হয়ে উঠছে মন্থরতর। সমুদ্র সর্বদাই গর্জমান, বহু দূর পর্যন্ত তরঙ্গরাশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে আসছে, আবার বেগে নেমে যাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে নামতেই সমুদ্রের বুক থেকে অতিবেগে বায়ু উত্থিত হলো। সমুদ্রের গর্জনের প্রচণ্ডতার সঙ্গে বালুকারাশি উড়তে লাগলো। চোখ খুলে রাখা দায় হলো। সারা গায়ে অজস্র তীক্ষ্ণমুখ সূচের মতো বালুকা বৃষ্টি হতে লাগলো। নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে, বালুকণা গললালী ও মুখের মধ্যে ঢুকে গেল।

শাম্ব দেখলেন, পাহাড়ের মতো বালুকারাশি ও সমুদ্রতীরে তিনি একলা। এতক্ষণ যাত্রীরা যারা তাঁর কাছাকাছি চলছিল, তারা ভিন্ন পথে নিকটবর্তী কোনো গ্রামে চলে গিয়েছে। তিনি দেখলেন, এক শ্রেণীর অনতিদীর্ঘ সাপ অনায়াসেই বালু-রাশি ঠেলে চলে যাচ্ছে। তিনি জানেন, এই সাপ অতি বিষাক্ত, কিন্তু সর্বদাই উদ্যত আক্রমণশীল না। শাম্ব এই প্রথম অনুভব করলেন, তিনি নিরস্ত্র। কোনো মানুষ বা শ্বাপদের দ্বারা আক্রান্ত হলে, তিনি কিছুই করতে পারবেন না। একমাত্র আশা, মানুষ তাঁকে কিছু করবে না। তাঁর কাছে এমন কিছুই নেই, যা দস্যু বা তস্করেরা লুণ্ঠন করতে পারে। কিন্তু কোনো শ্বাপদ সরীসৃপ তাঁকে শত্রুজ্ঞানে আক্রমণ করলে তিনি নিরুপায়।

বাতাস যেন হাজার বেগবান অশ্বচালিত হয়ে ছুটে আসছে, বিশাল বালু-বেলায় দাপাদাপি করছে। অথচ আকাশে মেঘ নেই। সূর্যাস্তের পরেই নক্ষত্র-রাজি ঝিকিমিকি করে উঠেছে। এই বাতাসের বেগ দেখলে, মনে হয় পৃথিবীও যেন অতিবেগে ঘূর্ণিত হচ্ছে। বালুকারাশির স্তূপ আশ্চর্য শব্দে ফেটে যাচ্ছে, এবং সেই ফাটলের গহ্বর দিয়ে, বাতাস সাপের মতো এঁকে বেঁকে, সোঁ সোঁ শব্দে ছুটে চলেছে। অন্ধকারে সমুদ্রের তরঙ্গে তীক্ষ্ণ ধারালো ঝকঝকে দাঁতের হাসি খলখলিয়ে বাজছে।

'হে অভিশপ্ত, কোনো দিকে দৃক্‌পাত করো না।' শাম্ব মনে মনে উচ্চারণ করলেন, এবং চলতে লাগলেন। সমুদ্র, বায়ুর তাণ্ডব, কোনো কিছুই তাঁর অধীন না। অতএব প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অনিবার্য জেনে, নিজের কর্ম করাই শ্রেয়। এই সময়েই, পূর্ব দিগন্তে এক ফালি তাম্রাভ চাঁদ দেখা গেল। আর শাম্ব মাছের আঁশটে গন্ধ পেলেন। গন্ধ পাওয়ামাত্র তিনি দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে সমুদ্রতীরের চারদিকে লক্ষ করলেন। এবং যা আশা করেছিলেন, তা দেখতে পেলেন। তাম্রাভ চাঁদের ম্লান আলোয়, দীর্ঘ ঋজু ঝাড়ালো কতগুলো গাছ, খানিকটা অঞ্চল জুড়ে নারকেল বীথির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্র থেকে কিছুটা পুবে, সেই গাছপালার মধ্যে, কতিপয় কুটিরের অবয়ব ও দু-একটি আলোর বিন্দু দেখতে পেলেন। মাছের আঁশটে গন্ধের ইঙ্গিতে তিনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন, কাছে-

পিঠেই কোথাও নিশ্চয় ধীবরপল্লী আছে। শাম্ব স্বস্তি বোধ করলেন। এই মহাসমুদ্রের ঝটিকাপ্রবাহিত বিশাল বালুবেলায় তিনি অত্যন্ত একাকী বোধ করছিলেন। তাঁর অন্তরে কোনো ভয় উৎপাদিত হয় নি। অভিশপ্ত মানুষ তার অভিশাপের বোঝা একাই বহন করে। শাপমোচনের প্রয়াসে একাই সংগ্রাম করে। তবু জগত সংসারে তাঁর পরিচয়, তিনি মানুষ। মানব জীবধর্মের এই নিয়ম, সংসারের বাইরে একাকী থেকেও সংসারের সীমান্তে দাঁড়িয়ে জীবনের ঘ্রাণ গ্রহণ করে।

শাম্ব ধীবরপল্লীর সীমানায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ঝড়ো বাতাসের ঝাপটায় গাছপালা যেন আভূমি নত হয়ে পড়ছে। কুটিরগুলো কাঁপছে। কিন্তু ধীবরপল্লীর কেউ ভয়ে ভীত নয়। শিশুরা কুটিরের ভিতরে ঘুমোচ্ছে। রমণী এবং পুরুষরা এখনো ঘরকন্না, জাল সেলাই, গোটানো এবং নানা ক্রীড়া-কৌতুক করছে। ঝড়ো বাতাসকে আড়াল করে কোনো কোনো ধীবর রমণী রান্না করছে। কিন্তু শাম্ব পল্লী মধ্যে প্রবেশ করতেই, তাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটলো, শান্তি বিনষ্ট হলো। তাঁর সেই অতি বিকট মূর্তি দেখে, অনেকেই ভয়ে ও অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়ালো। রমণীরা কুটিরে ঘুমন্ত সন্তানদের আড়াল করার জন্য দরজায় দাঁড়ালো। গৃহপালিত কুকুরেরা শাম্বকে দূরে থেকে চারদিকে ঘিরে প্রচন্ড চিৎকার জুড়ে দিল।

কুকুরের চিৎকার, ঝড়ে গাছপালার সোঁ সোঁ এবং সমুদ্রের গর্জন, সব মিলিয়ে, একটা তাণ্ডবের মাঝখানে যেন ভূতসহ নরনারী দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিঙ্গল আবছা জ্যোৎস্নায়, গাছপালা নরনারীদের ছায়াগুলো কিম্ভূত দেখাচ্ছে। শাম্ব সহজেই অনুমান করতে পারেন, তাঁকে কী রকম দেখাচ্ছে। তিনি ঝড়ের এবং কুকুরের চিৎকার ছাপিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, 'ভাই বন্ধুগণ, আমি সমুদ্র থেকে উত্থিত কোনো জলচর প্রাণী নই। আমি মানুষ, ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। ব্যাধিই আমাকে এরকম কুরূপ কুৎসিত করেছে। তোমাদের নারী পুরুষ সবাইকেই বলছি, আমাকে ভয় পেও না। আমার দ্বারা তোমাদের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।'

শাম্ব দেখলেন, তাঁর কথায় কাজ হলো। ধীবর রমণী পুরুষদের চোখ মুখের ভীতির ভাব অনেকটা অপসারিত হলো। তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো এবং বারে বারে শাম্বর দিকে দেখলো। একজন পুরুষ তাদের নিজেদের লোককে সম্বোধন করে বললো, 'আসলে আমি এই প্রাণীটিকে কোনো নরখাদক রাক্ষস ভেবেছিলাম। কিন্তু এর কথা আমাদের থেকেও ভালো। যেন কোনো উচ্চবংশজাত ব্যক্তির ন্যায় শালীনতাপূর্ণ। রাজরাজড়া বা ঋষিগণ যেভাবে কথা বলেন, এর কথাবার্তা সেই রকম।'

একজন রমণী সন্দিগ্ধ ভয়ে বললো, 'কিন্তু নরখাদক রাক্ষসেরা অনেক রকম মায়া জানে। কে বলতে পারে এর এরকম কথা মায়া ছাড়া কিছুই না?'

শাম্ব নিজেই রমণীর কথার জবাব দিলেন, 'তুমি যথার্থ বলেছো, কিন্তু রাক্ষসদের আচার আচরণ বিভিন্ন রূপ হয়। তারা হুংকার ছাড়ে, আবির্ভূত হয়েই তাণ্ডব করে, বাক্যবিনিময়ের কোনো চেষ্টাই করে না। দ্বারকা এখান থেকে খুব বেশি দূরে না। এ অঞ্চলে যদি কোনো রাক্ষসের বাস থাকতো, তা হলে বাসুদেব অথবা যদুবংশের কোনো বীর নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করতেন, তোমাদের জীবনকে নিরাপদ করতেন। আমি একজন নিতান্ত হতভাগ্য, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ।'

শাম্বর কথা শুনে, সকলেই যেন অনেকখানি আশ্বস্ত এবং সহজ হলো। কয়েক জন কুকুরগুলোকে হাত তুলে প্রহারের ভঙ্গিতে তাড়া করে দূরে সরিয়ে দিল। একজন বর্ষীয়ান রৌদ্রদগ্ধ তাম্রবর্ণ দীর্ঘদেহী পুরুষ জিজ্ঞেস করলো,

'তুমি কোথা থেকে আসছো, কোথায় যাবে?'

শাম্ব বললেন, 'আমি এখন দ্বারকা থেকে আসছি। পূর্বোত্তরের চন্দ্রভাগা নদীর ধারে মিত্রবনে আমি যাবো।'

শাম্ব জানেন, তাঁর পরিচয় দেওয়া বৃথা। তা অবিশ্বাস্য শোনাবে, তেমনি এদের কাছে তাঁর অভিশাপের বিষয় বলাও নিরর্থক। তিনি আবার বললেন, 'আমি আজ সারা দিনই চলছি। সহসা বাতাস ওঠায়, বালুর ঝড়ে, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত আর পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছি। যেখানে আমাকে যেতে হবে, সেই পথ আমার জানা নেই। দিক ঠিক না করে, রাত্রের অন্ধকারে আমি চলতে পারছি না। শুকনো মাছের গন্ধে টের পেলাম, এখানে নিশ্চয়ই কোনো বসতি আছে।'

শাম্বর কথাবার্তার উচ্চারণে ও ভঙ্গিতে সকলেই সহজ হয়ে গেল। তাদের অবিশ্বাস ভয় সন্দেহ দূর হলো। সেই ধীবর পুরুষটি বললে, 'কিন্তু চন্দ্রভাগা নদীই বা কোথায়, মিত্রবনই বা কোথায়?'

শাম্ব বললেন, 'শুনেছি, সিন্ধুনদের থেকে উৎপন্ন একটি বেগবতী শাখার নাম চন্দ্রভাগা। তারই তীরে কোথাও মিত্রবন আছে। সবই আমাকে খুঁজে নিতে হবে।' এই পর্যন্ত বলে শাম্ব প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, 'আমি আজ তোমাদের পল্লীর উপান্তে কোথাও রাত্রিটা শুয়ে কাটিয়ে দেবো। এখন এই সমুদ্রকূলের অন্ধকারে কোথাও মিষ্ট জলের সন্ধান করা আমার পক্ষে দুরূহ। আমি তোমাদের কাছে কয়েক গণ্ডুষ পানীয় জল আর কয়েক গ্রাস খাদ্যের প্রত্যাশী।'

ইতোমধ্যে ধীবর রমণী পুরুষরা শাম্বকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল, তিনি যেরকম কুৎসিত ও বিকলাঙ্গ দেখতে, তাঁর কথাবার্তা মোটেই সেরকম না। তাঁর কথা শুনলে, ধীমান ও শ্রীমান মনে হয়।

বর্ষীয়ান ধীবরটি বললো, 'তুমি খাদ্য পানীয় সবই পাবে। তুমি এখন বস। আমরা প্রথমে ভয় পেলেও, এখন আর তা নেই।'

শাম্ব নিশ্চিন্ত হয়ে একটি নারিকেল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন।

শাম্ব ক্রমাগত এইভাবে দিনের পর দিন চলতে লাগলেন। উত্তর সমুদ্রের তীর ধরে চলতে চলতে এক সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি সিন্ধুদেশের অভ্যন্তরে গমন করছেন। একটা নদী অতিক্রম করতে গিয়ে, এক ঋষিতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। শাম্ব তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল চন্দ্রভাগা নদীতীরে মিত্রবন কোথায়, তাঁর জানা আছে কী না।

সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তি বস্তুতপক্ষে একজন তপস্বীই ছিলেন। তিনি শাম্বকে বলেছিলেন, 'এই নদী অতিক্রম করা তোমার ঠিক হয়নি। আমি শুনেছি, মিত্রবন নামে এক সূর্যক্ষেত্র পঞ্চনদীর দেশে আছে। আরো শুনেছি, অন্তরীক্ষের পাদদেশে কোথাও সেই স্থান বর্তমান। তোমার ন্যায় চর্মরোগীরা সেখানে যায় আরোগ্যলাভের জন্য। বস্তুতপক্ষে সেখানে কী আছে, কেমনভাবেই বা চর্মরোগীরা আরোগ্যলাভ করে, আমার কিছুই জানা নেই। তবে আমার মনে হয়, তোমাকে সেই পঞ্চনদীর দেশেই যেতে হবে। তুমি নদী পার না হয়ে, ফিরে যাও।'

তপস্বীর মুখে চর্মরোগের কথা শুনে, শাম্বর মনে আর কোনো সন্দেহ ছিল না, তাঁর গন্তব্য মিত্রবনের কথাই তিনি বলেছেন। শাম্ব অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে তপস্বীকে প্রণাম করেছিলেন। তপস্বী তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন, 'তোমার

মনস্কামনা পূর্ণ হোক।'

শাম্ব বহু নদনদী অতিক্রম করে, অরণ্যের ভিতর দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে পূর্বোত্তর বরাবর চলেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে তিনি সহনীয় করে তুলেছিলেন। ক্রমেই অশক্ত হয়ে পড়া শরীরকে চালিত করে নিয়ে যাচ্ছেন। অরণ্যমধ্যে শ্বাপদকে ভয় করেন নি। কিন্তু গ্রাম ও জনপদের সর্বত্র প্রায়ই তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। বয়স্ক নরনারীরা যতোখানি ঘৃণা প্রদর্শন করে ততোখানি বিতাড়নের দ্বারা নিগ্রহ করে না। কিন্তু গ্রাম জনপদের বালকগণ, সারমেয়কুল সর্বত্র একই রকম। বালকেরা তাঁর গতিভঙ্গির বিকৃতিকেই কেবল অনুকরণ করে নি, প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করে তাড়া করেছে। তাদের সঙ্গে সারমেয়কুলও এক মুহূর্ত স্থির হতে দেয় নি।

শাম্ব অতি দুঃখের সময়ে কেবল মনে মনে উচ্চারণ করেছেন, 'তুমি অভিশপ্ত। শাপমোচনেই তোমার জীবনের মোক্ষলাভ। ভাগ্য অমোঘ। তাকে মেনে নিয়েই, দুর্ভাগ্য থেকে উত্তরণের সন্ধান করতে হয়। আমার কেন এমন দুর্ভাগ্য হলো, অপরের কেন হলো না, এইরূপ প্রশ্ন বাতুলতামাত্র। নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অপরের তুলনা করে, আত্মাকে ক্ষুব্ধ করা এবং কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। নিজের কষ্টের জন্য কারোকে দোষারোপ করাও অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া আর কিছু না। কেন জরা আছে, ব্যাধি আছে, মৃত্যু ঘটে, এই সব নিয়ে মানুষ বিলাপ করে, শোকাকুল হয়। অথচ এসবের আক্রমণ থেকে কারোরই রেহাই নেই। বলবীর্যের দ্বারা শত্রু নিধন মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তিস্থাপন যেমন ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম, তেমনি ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের জন্য, তাকে একাকী সংগ্রাম করতে হয়।'

শাম্ব গ্রামে জনপদে যখনই নিগৃহীত লাঞ্ছিত হয়েছেন, তখনই সহ্য করবার শক্তি সংগ্রহ করেছেন। কখনো কখনো তাঁর চোখ ফেটে জল এসেছে, কিন্তু কদাপি ক্রুদ্ধ হন নি। প্রতি-আক্রমণ কিংবা উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করেন নি। সুখ এবং দুঃখকে একত্রে গ্রথিত করে, সর্বদাই নির্বিকার থেকেছেন। অতীতের কথা বা বর্তমানের কথা ভাবেন নি। শুধু ভবিষ্যতের কথাই ভেবেছেন। গন্তব্যের দিকেই এগিয়ে চলেছেন, এবং মহর্ষি কথিত সেই অত্যুজ্জ্বল পুরুষের মূর্তিই কেবল কল্পনা করেছেন।

এইভাবে সাতটি ঋতু অতিক্রমের পরে, তিনি এক আসন্ন সন্ধ্যায় চন্দ্রভাগা তীরে পৌঁছুলেন। নৌকায় যারা নদী পারাপার করছিল, তারা কেউ কেউ নদীটিকে মহানদী বলেও উল্লেখ করছিল। শাম্ব দেখলেন, অতি বেগে পূর্ব-দক্ষিণ-গামিনী নদীটির বুকে রক্তাভ শার্ঙ্গাস্ত্রের মতো বঙ্কিম স্রোত ঝকঝক করছে এবং শৃঙ্গ দ্বারা প্রস্তুত ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো এক-একটি তীক্ষ্ণ রেখা ছুটে চলে যাচ্ছে। নদীর তীর বালুকারাশি পূর্ণ না, বরং সবুজ ঘাসে শস্ত মৃত্তিকা আচ্ছাদিত। ঋজু বিশাল মহীরুহসমূহ ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। যেন নদীকূলে এসে ক্লান্ত পথিকদের আশ্রয়দানের জন্য, আকাশবিদ্ধ বনস্পতিরাজিসমূহ দাঁড়িয়ে আছে। আসন্ন সন্ধ্যার রক্তাভা যেমন নদীর বুকে, তেমনি বনস্পতির শীর্ষে। কাছেপিঠে ঘন বসতি চোখে পড়ে না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু কুটির। নদী থেকে তীরভূমি বেশ উচ্চে। তথাপি, সম্ভবত বর্ষায় এ নদীতে বন্যা হয়, সেই জন্যই তীরে কোনো লোকালয় নেই। অথচ কর্ষিত ক্ষেত্রে ফসল ফলানো হয়েছে।

শাম্ব এই নদী দর্শন মাত্র, তাঁর অন্তরে গভীর আনন্দের সঞ্চার হলো। নদীর

এপারে ওপারে গমনাগমনকারী প্রতিটি পুরুষকেই তিনি, মনের সামান্যতম সন্দেহও মোচনের জন্য বারে বারে ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'সিন্ধু-নদ থেকে উৎপন্ন এই কি সেই চন্দ্রভাগা নদী?'

অনেকের কাছ থেকেই তিনি জবাব পেলেন না। অধিকাংশ লোকই তাঁকে এড়িয়ে গেল, যেন তাঁর প্রশ্নের অর্থ বুঝতেই পারে নি। আসলে তাদের বিরাগ ও বিতৃষ্ণা গোপন থাকছিল না। কেউ কেউ জবাব দিল, 'কোথা থেকে উৎপন্ন, সেসব জানি না। এই নদীর নাম চন্দ্রভাগা।'

চন্দ্রভাগা! শাম্ব যেন বারে বারেই নামটি শুনতে চাইছিলেন। কিন্তু মিত্রবন কোথায়? নদীর এপারে না ওপারে? এইটিই পঞ্চনদীর দেশ তো? সন্ধ্যার ছায়া যতো ঘন হতে লাগলো, খেয়া যাত্রীদের সংখ্যাও দ্রুত স্বল্প হয়ে উঠলো। শাম্ব শেষ পর্যন্ত মাঝির শরণাপন্ন হলেন। স্থানীয় অধিবাসী পুরুষ ও স্বল্প-সংখ্যক রমণীদের সকলেরই দেহের গঠন দীর্ঘ। আপাতদৃষ্টিতে তাদের চোখে মুখে রুক্ষতা থাকলেও নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় সকলেই বেশ রসিক ও আমুদে। অপরূপ নদীতীরে সুবিমল বাতাসে, তাদের সুখী দেখাচ্ছিল, এবং প্রায়ই প্রাণের স্ফূর্তিতে গান গেয়ে উঠছিল। তাদের গানের ভাষা অনেকটা পৈষ্ঠীপাত্রের গায়ে লেগে থাকা মক্ষিকার মতো, অশ্লীল ও ইতরতাপূর্ণ, কিন্তু নির্দোষ মনে হচ্ছিল। কারণ তারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে কিছু বলছিল না, নিজেদের কামোচ্ছ্বাসকে ব্যক্ত করছিল, এবং গান শুনে সকলেই হৈ হৈ করে হেসে উঠছিল।

শাম্বকে দেখেই মাঝির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হলো, চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠায়, দাড়ি কুঁকড়ে উঠলো। বললো, 'ওহে, তোমাকে আমি শেষ খেয়ায় পার করবো, এখন নিতে পারবো না।'

শাম্ব বললেন, 'ভাই, সেটা তোমার করুণা। আগে বা শেষে, যখনই তুমি আমাকে পার করো, পার হতে পারলেই আমি সার্থক জ্ঞান করবো।'

শাম্বর বিনীত বাক্যে মাঝি যেন একটু অবাক হলো। আসলে শাম্বর ভাষায় বিন্দুমাত্র অর্বাচীনতার স্পর্শ নেই। ধীমান ও জ্ঞানীর মতো তাঁর কথা শুনে, আরো কয়েকজন যাত্রী তাঁর দিকে তাকালো। কিন্তু প্রথম দর্শনেই সকলের মুখে বিমুখতা ফুটে ওঠে। শাম্ব আবার বললেন, 'এ দেশে আমি কখনো আসি নি। এই নদীর তীরে মিত্রবন নামক স্থানে আমি যেতে চাই। আমি শুনেছি, সে-স্থানকে সূর্যক্ষেত্র বলা হয়। সে-স্থান কি নদীর পরপারে?'

মাঝি চমৎকৃত হয়ে বললো, 'পরপারে বটে, কিন্তু এ ঘাটে পার হয়ে তোমাকে নদীর উত্তরদিকে সারা দিনের পথ যেতে হবে। তার চেয়ে রাত্রিটা তুমি এপারেই অতিবাহিত করে, নদীর উজানে তীর ধরে চারটি অতিক্রম বাঁক পাবে। ভোরে রওনা হলে, সন্ধ্যাকালের মধ্যে তুমি সেখানে পৌঁছুতে পারবে, আর সেখানেই খেয়া পার হবে।'

শাম্ব কৃতার্থ হয়ে বললেন, 'ভাই, পঞ্চনদীর দেশের মাঝি, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

মাঝি শাম্বর কথায় খুবই প্রসন্ন হলো, এবং তার চোখে মুখে করুণার অভিব্যক্তিও ফুটলো। সে বললো, 'এ পারে কোনো গ্রাম নেই, ওপারে গেলে, ঘাটের অদূরেই তুমি একটি গ্রাম পাবে। আমার মনে হয়, এপারে রাত্রে থাকা তোমার ঠিক হবে না। গভীর রাত্রে এপারে যক্ষগণ বাতাসে ভেসে বেড়ায়, নানা রকম গান বাজনা করে। সে এক রকমের ইন্দ্রজালের মায়া। সেই মায়ায় তুমি

ঘুমিয়ে পড়লে, হিংস্র জন্তু তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারে। তারা মানুষের রোগ ব্যাধি মানে না। তুমি অপেক্ষা কর, শেষ খেয়ায় আমি তোমাকে ওপারে নিয়ে যাবো।'

শাম্ব কৃতজ্ঞতায় কোনো কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না। মাঝির কথায় তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠলো। নৌকা ছেড়ে যাবার পরে, শাম্ব সাবধানে নদীর জলে অবতরণ করলেন। অবগাহন স্নানে যেন তাঁর সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা নদীতীরের এক স্থানে এসে তিনি উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ছোট ছোট টিলার গায়ে একটি কিংবা দুটি মানুষ কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকতে পারে, এমনি ধরনের মানুষের তৈরি কতগুলো গুহা। তার আশেপাশে, ঝোপঝাড়ের মুণ্ডসকল লতাগুল্মের দ্বারা শক্ত করে বেঁধে, একটি প্রবেশমুখ রেখে, এক ধরনের কুটির তৈরি করা হয়েছে, যার ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই, এবং ভিতরে নিশ্চয়ই মাথা সোজা করে বসাও যায় না। আশে-পাশে কয়েক জায়গায় কাঠের আগুন জ্বলছে। তারই লেলিহান শিখার আলোয়, শাম্ব সেই সব গুহা ও কুটিরের সামনে কিছু মানুষকে নড়েচড়ে বেড়াতে দেখলেন। পুরুষ এবং রমণীর কণ্ঠস্বরও তাঁর কানে এলো।

শাম্ব মনে মনে অবাক হয়ে ভাবলেন, এরা কারা? কোনো যাযাবর জাতির গোষ্ঠীভুক্ত, অথবা অরণ্যবাসী কিরাতগণ? ভাবতে ভাবতে তিনি সেই সব গুহা ও কুটিরের সামনে এগিয়ে গেলেন। কাঠের আগুনের আলোয় তাঁর মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠতেই কয়েকজন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। শাম্বর বুকে যেন বিদ্যুতের ঝলক হেনে গেল। দেখলেন, তাঁর সামনে যে-কজন এসে দাঁড়িয়েছে, তারা সকলেই তাঁর মতো কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। শাম্ব এবং তাদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, কয়েকজন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রমণীও সামনে এসে দাঁড়ালো। যাদের দু-একজনের কোলে শিশু! আশ্চর্য, শিশুরা কেউ রোগগ্রস্ত না।

শাম্ব মুহূর্তেই অনুমান করতে পারলেন, এ অঞ্চলই মিত্রবন। যে-কথা তিনি মহর্ষি নারদের কাছে শুনেছিলেন, এরাও নিশ্চয় সেরকম ভাবেই কারো কাছ থেকে শুনে, এখানে আরোগ্যলাভের জন্য এসেছে। তিনি সন্দেহ মোচনের জন্য প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'এই স্থানের নাম কি মিত্রবন?'

একজন পুরুষ জবাব দিল, 'তাই তো শুনেছি।'

শাম্বর মনে পড়লো, মহর্ষি নারদের সূর্যক্ষেত্রের সেই বিস্ময়কর বর্ণনা, যেখানে গ্রহরাজ সূর্যকে ঘিরে অষ্টাদশ দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, অপ্সরাগণ, দণ্ড-নায়ক ও দিণ্ডি দণ্ডায়মান রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই সূর্যক্ষেত্র কোথায়, যেখানে গ্রহরাজ পরমাত্মন্ অবস্থান করছেন?'

শাম্বর কথা শুনে, সবাই হেসে উঠলো। কেউ বললো, 'এর কথাবার্তা বেশ রাজপুরুষদের মতন চোকস।'

কেউ বললো, 'ঋষির মতনও বলা যায়।'

শাম্ব অবাক হয়ে শুনলেন, এদের কথাবার্তা রীতিমতো অর্বাচীন, ইতর শব্দে ভরা। এদের কি পুরুষ, কি রমণী, সকলেই এমনভাবে গ্রহরাজের কথা শুনে হাসাপরিহাস করছে, যেন তারা ব্যাধিগ্রস্ত নয়। একজন এগিয়ে এসে বললো, 'তোমার মতন আমরাও অনেক কথা শুনে এখানে এসেছি। কিন্তু ওই

যে সব গ্রহরাজ-টাজ কী সব বলছো, ওসব আমরা কিছুই দেখি নি। তবে মান্ধাতা আমলের একটা মন্দির আছে। ওটাকেই সবাই সূর্যক্ষেত্র বলে।'

শাম্বর অন্তর এক রকমের অশান্তি ও অস্বস্তিতে ভরে উঠলো, জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই মন্দিরে কোন্ দেবতার বিগ্রহ আছে?'

সবাই আবার পরিহাস করে হেসে উঠলো, এবং একজন বললো, 'সেটা মন্দিরই কী না, আমরা জানি না। মাথার ওপরে ছাতা, আর রাজার মতন জুতো জামা পরা একটা মূর্তি আছে। ও-ই নাকি সূর্যমূর্তি। আমরা রোজ তাকে একবার করে গড় করি।'

অনেকে প্রতিধ্বনি করলো 'হ্যাঁ, আমরা চন্দ্রভাগার জলে রোজ চান করে, সেই মূর্তিকে একবার গড় করি। তার আশেপাশে আরো অনেক মূর্তি আছে, ওরাও নাকি সবাই দেবতা। এদেরও গড় করি।'

একজন পুরুষ বললো, 'অপ্সরা মূর্তি বেশ সুন্দর, আমি রোজ তার গায়ে গা ঘষি।'

আর একজন বললো, 'আমরা রোজ সকালে চন্দ্রভাগায় নেয়ে, মন্দিরে গড় করে ভিক্ষে করতে বেরোই। আর এ সময়ে এসে ভিক্ষার অন্ন ফুটিয়ে খাই।'

অন্য একজন বললো, 'আমরা সংসারও করি। এই সব মেয়েছেলেরা প্রতি বছরই পোয়াতি হয়, আর বাচ্চা বিয়োয়।'

ভস্মকেশ, বিকলাঙ্গ, বিবর্ণ, পুচ্ছহীন রক্তচক্ষু রমণীরা সবাই হেসে উঠলো, এবং একজন বললো, 'আমাদের বাচ্চাগুলো প্রথমে খুব ফুটফুটে হয়ে জন্মায়। চার পাঁচ বছর বয়স হলেই ওরা আস্তে আস্তে আমাদের মতন হয়ে যায়।'

একটি রমণী তার বুকের ফুটফুটে শিশুটিকে দেখিয়ে বললো, 'এই দ্যাখো, এখন কেমন সুন্দর দেখতে। ও আমার পেটেই জন্মেছে। ওর বাবারও কুষ্ঠ ছিল, দুদিন হলো মরে গেছে। আমার এই ছেলে যখন একটু বড় হবে, তখন ওরও কুষ্ঠ হবে। কিন্তু সে সব নিয়ে আমি ভাবি না। রাত হলেই পুরুষের সঙ্গে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। তুমি নতুন এসেছো, এখন থেকে আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো।'

সবাই হৈ হৈ করে সমর্থন করলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন থেকে তুমিই ওর সঙ্গে থাকবে। মেয়েদের মধ্যে ও এখন সব থেকে বয়সে ছোট। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আগে বেশ সুপুরুষ ছিলে।'

পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে, শিশু কোলে রমণীটি শাম্বর দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো।

একজন চিৎকার করে বললো, 'এখানে সবাই রোগ সারাতে আসে, কিন্তু এমন কোনো দিব্য ব্যাপার নেই যে, রোগ সারে। চামড়া ভেদ করে আমাদের হাড়ে দুব্বো গজিয়ে যায়, আর আমরা মরে যাই। আমাদের ছেলেমেয়েরা থাকে, তার আগের জন্মিত ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে যায়, আর তোমার মতন নতুন নতুন লোক এখানে রোগ সারাতে আসে।'

শাম্বর মনে হলো, কোনো মায়ার দ্বারা তিনি আবিষ্ট হয়েছেন। তাঁর কোন বাহ্যজ্ঞান নেই। অচৈতন্য অবস্থায় তিনি কোন নরকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এ স্থান কখনোই মিত্রবন হতে পারে না। এদের সকলের পরিহাসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একটি অসহায় অবিশ্বাসই ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন, নানা স্থান থেকে এরা এখানে এসেছে, সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপনের দ্বারা সন্তান

উৎপাদন করেছে। এদের কারো সঙ্গেই কারোর কোনো সম্পর্ক নেই। বংশ-পরম্পরা বলেও কিছু নেই। সমাজ ও সংসার থেকে বহিষ্কৃত এক ব্যাধিগ্রস্ত বাহিনী, যারা আরোগ্যের আশা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আরোগ্যলাভ দূরের কথা, ব্যাধিতে ভুগে মৃত্যুকেই এরা অবধারিত জেনে কিছুদিনের জন্য যদৃচ্ছা জীবন ধারণ করে যাচ্ছে। এদের কোনো আশা নেই, অতএব, কোনো বিশ্বাসও নেই। অথচ এরা অবিশ্বাসী ছিল না। তা হলে এখানে আসতো না।

শাম্ব সহসা দেখলেন, তাঁর চার পাশে ছায়ার মতো সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। একজন চিৎকার করে বললো, 'ওহে, তুমি যে একেবারে মুনি-ঋষিদের মতন দেবতায় পাওয়া লোক হয়ে গেলে! জিজ্ঞেস করছি, কোথা থেকে আসছো?'

শাম্ব সংবিৎ ফিরে পেয়ে, সকলের দিকে তাকালেন। দেখলেন সেই শিশু-বুকে যুবতী কুষ্ঠ রোগিণীটি তাঁর গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি জবাব দিলেন, 'কোথা থেকে এসেছি, সে কথায় আর কী কাজ? অতীতকে ভুলে যাওয়াই শ্রেয় নয় কী?'

অনেকে একসঙ্গে বলে উঠলো, 'ঠিক ঠিক! কিন্তু তোমার কথাবার্তার ধরন-ধারণগুলো বড্ড জ্ঞানীগুণীদের মতন লাগছে। বলি, তোমার কি ক্ষুধা তেষ্টা বলে কিছু আছে? থাকলে আমরা দিতে পারি।'

শাম্ব প্রকৃতই ক্ষুধার্ত ছিলেন। সেই ভোরে, নদীতীরের নরম মৃত্তিকার জঙ্গল থেকে, কয়েকটি মূল তুলে জলে ধুয়ে চিবিয়েছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ক্ষুধার্ত। তোমাদের সকলের সংকুলান হলে, আমাকেও কিছু খেতে দাও।'

শাম্ব এই কথা বলা মাত্র, তাঁর পার্শ্ববর্তিনী সেই রমণী তার শিশুটিকে তাঁর বুকের ওপর প্রায় নিক্ষেপ করে বললো, 'তা হলে তুমি আমার ছেলেকে ধরো, আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসছি।'

সকলেই সমর্থন করে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নীলাক্ষিই আমাদের নতুন সঙ্গীকে খেতে দিক।'

শাম্ব মনে মনে উচ্চারণ করলেন, 'নীলাক্ষি!' নাম শুনে বোঝাই যায় না, এই রমণীও একদা নীলাক্ষি ছিল। অবিশ্যি, কাকেই বা বোঝা যায়? এ চিন্তা বাতুলতা। কিন্তু শিশুটিকে নিয়ে তিনি অস্বস্তিতে পড়লেন। নতুন মানুষের কোলে সে কিছুতেই থাকতে চাইছে না, চিৎকার কান্না জুড়ে হাত-পা ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে। তিনি অসহায় চোখে, উদ্ধারের প্রত্যাশায় আশে-পাশের সকলের দিকে তাকালেন। কিন্তু বৃথা। তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ করার জন্য উপস্থিত পুরুষ বা রমণীগণের মধ্যে কেউ এগিয়ে এলো না, হাত বাড়িয়ে দিল না। বরং তাঁকে শিশুটি নিয়ে বিব্রত ও উদ্‌ব্যস্ত হতে দেখে, সকলেই যেন বিশেষ কৌতুক বোধ করে নিজেদের মধ্যে হাস্যপরিহাস করতে লাগলো। কেউ কেউ বললো, 'নীলাক্ষির ছেলে নতুন বাপকে এখনো চিনতে পারছে না। ওহে ছেলের বাপ, ছেলেকে একটু আদর করছো না কেন?'

কেউ বললো, 'তোমার ঘরে কি বউ ছিল না? তোমার কি ছেলেমেয়ে ছিল না? তুমি কি গৃহস্থ ছিলে না? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন মোটে ঘরকন্না করা জানো না। কেন হে, তুমি কি রাজ-রাজড়ার ছেলে নাকি?'

শাম্ব মনে মনে বললেন, 'আমার একটাই মাত্র পরিচয়, আমি অভিশপ্ত।' তিনি শিশুটির অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করলেন, তাঁর মনে করুণা ও স্নেহের উদ্রেক হলো। শিশুটিকে নানা ক্রীড়া কৌতুকের ভঙ্গি করে, শান্ত করতে

চেষ্টা করলেন। বুকে চেপে, শূন্যে দুলিয়ে তাকে খুশি করবার বিবিধ কৌশল অবলম্বন করলেন। শিশুটি এখনো আশ্চর্য উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যবান এবং নিষ্পাপ। সে শাম্বর আচরণে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলো। কান্না থামলো। জন্ম-বধি সে কুষ্ঠরোগগ্রস্তদের দেখে অভ্যস্ত, অতএব শাম্বর মুখের প্রতি কৌতূহল-বশে তাকিয়ে সে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো না। রোগাক্রান্ত কুৎসিত মুখের দিকে তাকিয়ে সে স্নেহ ও সোহাগ সন্ধান করে নিতে পারে। শিশুটির চোখের বর্ণ নীল। নীল আকাশ প্রতিবিম্বিত চন্দ্রভাগার রৌদ্রচকিত জলের ন্যায় উজ্জ্বল। নীলাক্ষির চোখ দুটিও কি একদা এই রকম ছিল?

শাম্ব দেখলেন, তাঁর চারপাশে পুরুষ ও রমণীদের মধ্যে কিছু বালক-বালিকা রয়েছে, যারা ইতিমধ্যেই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এরা সকলেই সুস্থ দেহে জন্মগ্রহণ করেছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যাধি এদের আক্রমণ করেছে। এরাও কি অভিশপ্ত? অন্যথায়, কী অপরাধ এইসব বালক-বালিকাদের, যাদের অসহায় চোখে মুখে হতাশা ও অবিশ্বাস? এদের যদি কোনো অপরাধ থেকে থাকে, তার একমাত্র কারণ, তারা এই সব পুরুষ ও রমণীদের ঔরস ও গর্ভজাত সন্তান। এ কি কোনো পূর্ব জন্মের পাপের ফল? অমোঘ ভবিতব্য?

শাম্ব নিজেও ব্যাধিগ্রস্ত, কিন্তু তিনি পিতার দ্বারা অভিশপ্ত। অমোঘ তার পরিণতি। তাঁর অন্তর কাতর হলো, ব্যথায় দ্রবীভূত হলো, এই সব রমণী-পুরুষ বালক-বালিকা আর শিশুদের দেখে। এদের মুক্তির কি কোনো উপায় নেই? তাঁর নিজের মুক্তিরই বা কী উপায়? মহর্ষি নারদোক্ত বৃত্তান্ত তো কখনো মিথ্যা হবার না। তিনি কি প্রকৃতই মহর্ষি কথিত সেই সূর্যক্ষেত্র মিত্রবনেই এসে-ছেন? অথচ এই স্থান, এই সব হতমান অবিশ্বাসী ব্যাধিগ্রস্তদের দেখে তা মনে হয় না।

শিশুটি আবার হাত-পা ছুঁড়ে কান্নাকাটি শুরু করলো। সৌভাগ্য, নীলাক্ষি নাম্নী রমণীটি খাদ্য নিয়ে এল। শাম্বর সামনে খাদ্যের মৃত্তিকাপাত্র রেখে, ছেলেটিকে নিজের কোলে নিয়ে বললো, 'বসো, খাও।'

শিশুটি মায়ের কোল পেয়ে যেন ইন্দ্রজালের দ্বারা বশীভূত ও শান্ত হলো। শাম্ব পার্শ্ববর্তী একজন পুরুষকে লক্ষ করে বললেন, 'হাত ধোয়া আর কুল-কুচার জন্য জল পাওয়া যাবে?'

লোকটি হৈ হৈ করে উঠলো, 'দ্যাখ দ্যাখ, এ নিজেই বলছিল, অতীতের কথায় কাজ কী? কিন্তু এ নিজেই এখনো আগের জীবনের কথা ভুলতে পারে নি। খাবার আগে হাত ধুতে চায়, মুখ ধুতে চায়।'

আর একজন বললো, 'আমরা তো এখন হাতে কোনো সাড়ই পাই না। জল দিয়ে ধুলেও টের পাই না, আগুনে পোড়ালেও টের পাই না। ভিক্ষের অন্ন ফুটিয়ে খাবো, তার আবার হাত ধোয়াধুয়ি কিসের?'

অন্য আর একজন বললো, 'এর কথাবার্তা ভাবভঙ্গি সবই যেন আমাদের থেকে আলাদা।'

এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বৃদ্ধ গলিত দন্ত, রক্তাভ হাঁ-মুখে হাস্য করে বললো, 'কিছুদিন যেতে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবে ও আমাদের মতোই হয়ে গেছে।'

এই সময়ে সদ্য রোগাক্রান্ত একটি বালিকা, জলপূর্ণ একটি মৃত্তিকার পাত্র শাম্বর খাদ্যের পাত্রের সামনে এনে রাখলো। শাম্ব কৃতজ্ঞ চোখে বালিকাটিকে

দেখে, মৃদু হাসলেন। জলের পাত্র নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে খাদ্যের পাত্রের সামনে বসলেন। সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি একলাই খাবো? তোমরা?'

নীলাক্ষি বললো, 'আমরা ভিক্ষা শেষে ফিরে এসেই, ফুটিয়ে নিয়ে খেয়েছি। ওই দেখছো না, এখনো রান্নার আগুন জ্বলছে।'

একজন পুরুষ বললো 'আমরা সারাদিন দূরদূরান্তরে ভিক্ষে করি, ফিরে এসেই আগে পেটের জ্বালা মেটাই। যা তন্ডুল থাকে, কিছু খাই, বাকিটা কাল সকালের জন্য রেখে দিই। সকালে খেয়েই আবার বেরিয়ে পড়ি।'

শাম্ব নীলাক্ষির দিকে ফিরে বললেন, 'এই খাদ্য তুমি আগামী সকালের জন্য রেখে দিয়েছিলে? রাত পোহালে তুমি কি খাবে?'

নীলাক্ষি তার রক্তিম ক্ষতযুক্ত স্ফীত অধরোষ্ঠ বিস্ফারিত করে হেসে বললো, 'ওহে প্রাণ, তোমাকে যা দিয়েছি, তা খাও। আমার এখনো কিছু রাখা আছে, সকালে তাই খাবো। তোমার খিদে না মিটলে যেটুকু রেখে দিয়েছি, তাও তোমাকে দিয়ে দেবো।'

একজন রমণী বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি খাও। নীলাক্ষি তোমাকে পেয়ে খুশী, তোমাকে খাইয়ে ও আরো খুশী। তুমি তোমার দানটা রাত্রে ভালো করে দিও, নীলাক্ষিকে সুখী করো।'

সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। আগুনের শিখার আলোয়, তাদের সবাইকেই অতি ভয়ংকর প্রেতমূর্তির ন্যায় দেখালো। নীলাক্ষি খিলখিল করে হেসে, শাম্বর হাঁটুতে একটা চাপড় মারলো, এবং তার পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে অতিপ্রার্থিনীর উল্লাসে ইশারা করলো। শাম্ব যেন অন্তরে শিহরিত হলেন। এই শিহরণে কোনো সুখ বা কামোচ্ছ্বাস নেই। এই শিহরণ তাঁর কাছে পূর্ব জীবনের স্মৃতিযুক্ত, অথচ ভয়জাত। তিনি অভিশপ্ত, কারণ তিনি রমণীমোহন ছিলেন। সেই অভিশাপের ফল তিনি বহন করছেন। গৃহ থেকে বিদায়ের পূর্বে, লক্ষ্মণার অতি কাতর প্রার্থনায়, পত্নীর ধর্মরক্ষার্থে, তিনি জীবনের শেষবারের জন্য রমণ করেছেন, অথচ তা কামোদ্দীপ্ত ভোগের উচ্ছ্বাসে তৃপ্ত হবার জন্য না। এখানে নীলাক্ষির আশাও তিনি পূরণ করতে পারবেন না।

শাম্বর মনে স্বতঃই একটি বিরোধ সৃষ্টি হলো। যার সারাদিনের আহরিত অন্ন তিনি গ্রহণ করবেন, সে একটি বিশেষ প্রত্যাশায় তা পরিবেশন করছে। অথচ তার প্রত্যাশা পূর্ণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না। অতএব খাদ্যপাত্র স্পর্শ না করে তিনি নীলাক্ষিকে বললেন, 'আমি তোমার প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারবো না, তোমার সঙ্গে সহবাস আমার দ্বারা সম্ভব না। কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত, আমি কি তবু এই অন্ন খেতে পারি?'

নীলাক্ষি হেসে উঠলো, এবং শাম্বর কথা যারা শুনতে পেলো, সবাই হৈ হৈ করে হেসে উঠলো।

একজন বললো, 'ওহে নয়া মানুষ, ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমাদের নীলাক্ষি ও বিষয়ে অনেক তুকতাক জানে। যা করবার সে-ই করে নেবে।'

সবাই উল্লাসে হেসে উঠলো। নীলাক্ষিও তাদের মতো হেসে শাম্বকে বললো, 'আমি বলছি তোমাকে, এখন পেটের খিদে তো মেটাও। অন্য খিদের কী হয়, তা পরে দেখা যাবে।'

নীলাক্ষির কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সকলেই বুঝতে পারলো, এবং সবাই এক সঙ্গে নীলাক্ষিকে সমর্থন করলো। শাম্ব দেখলেন, বালক-বালিকারাও

বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা শুনে, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। তাদের চোখ মুখের অভিব্যক্তি দেখলেই বোঝা যায়, বয়স্কদের কথার অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাদের ক্রীড়া কৌশলের কোনো কিছুই তাদের অজ্ঞাত না। যখন মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে যায় তখন তার জীবনে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। থাকে কেবল শিশ্নোদরপরায়ণতা। এদের দেখে, শাম্ব তাঁর জীবনে এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করলেন। কিন্তু মুক্তির কী উপায়? ব্যাধি থেকে আরোগ্যই মুক্তি। মুক্তিই দেয় নতুন জীবনের সন্ধান।

শাম্ব এই সব হতমান অবিশ্বাসীদের সামনে বসেও, অন্তরের অটুট বিশ্বাসকে অনুভব করলেন। তিনি যদি ভুল স্থানে এসে থাকেন, তবে আবার মহর্ষি নারদের সন্ধানে যাবেন। এই কল্প গ্রহণ করে তিনি নীলাক্ষির দেওয়া খাদ্য খেলেন। বিভিন্ন প্রকারের তন্ডুলের সহযোগে, নানা শাক ও মূল সিদ্ধ করা খাদ্য। শাম্ব অতি উপাদেয় জ্ঞানে এই খাদ্য খেলেন। জলপান করে তৃপ্ত হলেন। তারপরে, তাঁর চারপাশে যারা উপবিষ্ট ছিল, তাদের উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা বললে এখানে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মধ্যে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে আছে। আমরা রোজ তাকে গড় করি।'

শাম্ব হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বললেন, 'মন্দিরে বিগ্রহ থাকলেই তাঁর নিত্য পূজাদি হয়। এই মন্দিরের বিগ্রহের পূজার কী ব্যবস্থা আছে?'

সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, যার ফলে শাম্ব কোনো কথাই উদ্ধার করতে পারলেন না। তিনি সবাইকে নিরস্ত করে একজন বৃদ্ধকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তুমি বলো, তোমার কাছ থেকে শুনি।'

বৃদ্ধের অঙ্গ এখন গলিত-প্রায়। নাসিকার হাড় সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত, দুইটি ছিদ্র ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে সানুনাসিক স্বরে বললো, 'আমি ওই মন্দিরে কখনো পূজা হতে দেখি নি। তবে মন্দিরের পুব দিকে একজন মুনি-পুরুষের আশ্রম আছে। সে কখনো মন্দিরের বিগ্রহের পূজা করে না।'

'কিন্তু আমাদের বেহ্মচায্যি পালন করতে বলে।' একজন ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলো।

আর একজন বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই মুনি ব্যাটা আমাদের উপোস করতে বলে। বেহ্মচারি হতে বলে। রোজ ভোরবেলা চান করে, সূর্যের দিকে মুখ করে বসে থাকতে বলে।'

'সে আরো অনেক কিছু বলে।' আর একজন বলে উঠলো। 'তার কথার মাথামুণ্ডু আমরা কিছুই বুঝি না। আমরা জানতাম এখানে এসে চন্দ্রভাগায় নাইলেই আমরা ভালো হয়ে যাবো। কিন্তু সবই ফক্কিকারি। আমরা যদি তপস্যাই করবো, তবে ভিক্ষে করবো কখন? আমাদের খেতে দেবে কে? মুনিটা বলে, তোমরা এই নদীর ধারে চাষ আবাদ করো। আমরা কি এখানে ঘর-সংসার করতে এসেছি? আমরা সবাই একদিন পচে-গলে মরে যাবো। রোজই একটু একটু করে আমাদের হাত-পা খসে যাচ্ছে।'

লোকটির কথা শুনে কেউ কেউ আর্তনাদ করে উঠলো। আহত পশুর ন্যায় সেই আর্তনাদে, নদীকূলের বিস্তৃত অন্ধকার ভূমি, ঝোপঝাড়, গাছপালা, এখনো অবশিষ্ট কয়েকটি আগুনের শিখায় যেন এক ভয়ংকর নরক সদৃশ হয়ে উঠলো।

অচিরাৎ মৃত্যুভয়েই যেন কেউ কেউ নিজেদের আলিঙ্গন করে ক্রন্দন করতে লাগলো। অন্যদিকে অন্ধকারে চলে গেল কেউ। শাম্ব গম্ভীর আর চিন্তিত হয়ে পূর্বদিকে তাকালেন। কে মুনি ঋষি এখানে আশ্রম করে আছেন? অথচ তিনি মন্দিরের বিগ্রহের কোনো পূজা করেন না। কিন্তু এদের নানা প্রকার উপদেশ দান করেন? এদের কথাবার্তা থেকে সম্যক কিছুই বোঝার উপায় নেই। শাম্বর কাছে এ স্থান অপরিচিত। এই রাত্রের অন্ধকারে এখন মন্দির প্রাঙ্গণে বা মুনির আশ্রমে যাওয়া উচিত হবে না। যদিও সেই স্থানে যাবার জন্য তিনি ব্যাকুলতা বোধ করছেন, কাল এবং স্থান চিন্তা করে, চিত্তকে দমন করলেন।

শাম্ব দেখলেন, প্রায় সকলেই যে যার মৃত্তিকা গহ্বরে বা পাতা ঝোপের কুটিরে গমন করেছে। দু-একজন রমণী পুরুষ বালক-বালিকা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বসে আছে। প্রায় নিভন্ত দু-একটি ক্ষীণ আগুনের শিখা এখনো জ্বলছে। নীলাক্ষি এখনো ঘুমন্ত শিশু কোলে নিয়ে তাঁর পাশে বসে রয়েছে। শাম্ব স্মরণ করতে পারেন না, কতোক্ষণ পূর্বে শৃগাল প্রহর ঘোষণা করেছে। কিন্তু করেছে, তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। এখন মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে কালো পাখা বিস্তার করে রাত্রিচর পাখীরা উড়ে যাচ্ছে। নদীর কলকল শব্দের মধ্যেও পাখীদের পক্ষ সঞ্চালনের মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। সন্ধ্যা-তারা পূর্ব দিগন্ত থেকে অনেকখানি উঠে এসেছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল ও বিভিন্ন নক্ষত্ররাশি, কৃষ্ণ আকাশে অতি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

শাম্ব নীলাক্ষির দিকে তাকালেন। নীলাক্ষি তার পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে শাম্বর দিকেই তাকিয়েছিল। সহবাস কামনায় অতি ব্যাকুলতা তার চোখে নেই, কিন্তু গভীর প্রত্যাশা নিয়ে সে বসে আছে। শাম্ব কোমল স্বরে বললেন, 'সকলেই যে যার আশ্রয়ে চলে গেছে। তুমিও তোমার ছেলেটিকে নিয়ে ঘুমোতে যাও।'

নীলাক্ষি আশাহত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আর তুমি? তুমি কী করবে, কোথায় থাকবে?'

শাম্ব বললেন, 'আমি যেখানে আছি, সেখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবো।'

নীলাক্ষির পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখে আতংক ফুটে উঠলো। চার পাশে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো, 'কী করে তুমি সারা রাত বাইরে থাকবে? এখনই নেকড়েরা ছুটে আসবে। তারা কুষ্ঠ রোগীদের রেহাই দেয় না। আমাদের মাটির গর্তের ঝাঁপে আর পাতার ঘরেও তারা হামলা করে, নখ দিয়ে আঁচড়ায়। তুমি বাইরে থাকলে, ওরা তোমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।'

শাম্ব মুহূর্তেই ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমি এখনই অগ্নিকুন্ডের আগুন উস্কে তুলবো, আগুনের পাশে বসে থাকবো। নেকড়ের দল এলে আমি আগুন নিয়ে তাদের তাড়া করবো।'

নীলাক্ষি শাম্বর কথায় বুঝতে পারলো, তিনি যা বলছেন, তা করবেন। সে বললো, 'কিন্তু আমি তোমার আশায় বসে আছি। আমি একলা থাকতে পারি না। একজন পুরুষ না থাকলে আমার সবই ফাঁকা লাগে।'

শাম্বর কাছে এই সরল স্বীকারোক্তি মর্মন্তুদ বোধ হলো। তিনি কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে পুরুষ দুদিন আগেও তোমার সংগে থাকতো, তার জন্য তোমার শোক-দুঃখ কিছু নেই? তাকে কি তুমি ভুলে গিয়েছ?'

নীলাক্ষি মাথা নেড়ে বললো, 'কেন ভুলে যাবো? তাকে আমার ভালোই মনে আছে। আমি তার জন্য অনেক কেঁদেছি। কিন্তু আমাদের জীবনে ওসব শোক-

দুঃখের কী দাম আছে? তুমি শুনলে না, আমরা রোজই একটু একটু করে পচে-গলে মরে যাচ্ছি? তোমার মতন নতুন যারা আসে তারা সবাই কয়েকদিন এই রকমই ভাবে। আলাদা আলাদা দূরে সরে থাকতে চায়। তারপরে যখন বুঝতে পারে, ওতে কোনো লাভ নেই, তখন সকলের সংগে মিশে যায়। তুমিও যাবে। তবে মিছে কেন দেরি করছো? আমাদের ঘর সমাজ বলে এখন কিছুই নেই। মরতে মরতেও আমরা আমাদের নিয়েই থাকবো। আমাদের এখন কোনো পাপও নেই পুণ্যও নেই। পুড়ে-যাওয়া-পাখা মৌমাছি যেমন ফুলের গায়ে লেগে থেকে মরে যায়, আমরা সেইভাবেই মরতে চাই। যেটুকু সুখ মেটে তাই মিটিয়ে নিই। তুমি আমার সংগে চলো। তোমাকে আমি সুখী করবো।'

শাম্ব অনুভব করলেন, নীলাক্ষির প্রতিটি কথাই অতি নিষ্ঠুর বাস্তব। ব্যাধি ও নিশ্চিত বীভৎস মৃত্যু আশাহীন জীবনের কথা। কিন্তু তিনি বিচলিত নন, এখনো মুক্তির অভিলাষী। তিনি কোনো যুক্তি দেখালেন না, বললেন, 'নীলাক্ষি, আমি তোমার কথা বুঝেছি। তুমি আমাকে মার্জনা করো, আমাকে ত্যাগ করে তুমি তোমার শিশুটিকে নিয়ে আশ্রয়ে যাও।'

নীলাক্ষি তথাপি বললো, 'আমার যদি রোগ না হতো, আমি যদি সমাজ সংসারে থাকতাম, তুমিও যদি সুস্থ থাকতে, তবে কখনোই আমাকে এভাবে এড়িয়ে যেতে পারতে না। তোমার কথা থেকেই বোঝা যায়, তুমি রাজরাজড়া ঋষিদের মতো সবই জানো। কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারো না, আমার এই যে শরীরটা, এর বাইরে কোনো সাড়ই এখন আর নেই। তুমি যদি আমার বুকেও হাত দাও, আমি টের পাবো না। এখন শুধু শরীরের ভেতরেই সাড় আছে। যেমন জিভ দিয়ে এখনো খাবারের স্বাদ পাই। হয়তো মরার আগে পর্যন্ত এই সাড়ই থাকবে। এই সুখটুকু তুমি কেন আমাকে দেবে না?'

শাম্ব বুঝলেন, নীলাক্ষির এই সব উক্তি অধিকতর বাস্তব ও মর্মন্তুদ। সে কোনো কথাই প্রচ্ছন্ন রাখে নি। কিন্তু কী করে বলবেন, তিনি পিতার দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত। শাপমোচনের জন্যই তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। তাঁর জীবনে সে-ই ধ্রুব ও মোক্ষ। তিনি করজোড়ে বললেন, 'নীলাক্ষি, আমাকে ক্ষমা করো। তোমাকে সামান্য সুখী করতে পারলেও আমি সুখী হতাম। আমাকে অক্ষম জ্ঞানে তুমি ক্ষমা করো।'

'নীলাক্ষির পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখ হতাশায় ও ক্ষোভে জ্বলে উঠলো। তার ভগ্ন নাসা, ক্ষয়-ক্ষত ঠোঁট, স্ফীত পাংশু মুখ শক্ত হলো। শিশু কোলে সে উঠে দাঁড়ালো, 'তুমি অক্ষমই থাকো। তোমাকে ধিক! আমি যখন সুস্থ ছিলাম, তখন ঋষি পুরুষরাও আমার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হতো। এখানে এখন যতো পুরুষ আছে, আমি যাকে ডাকবো, সে-ই আমার কাছে ছুটে আসবে। এর পরে তুমি আমাকে চাইলেও আর পাবে না।' এই বলে সে ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

শাম্ব নতমুখে বসে রইলেন। তিনি জানেন, নীলাক্ষির অভিশাপ তাঁকে স্পর্শ করবে না, কারণ তিনি অভিশপ্ত হয়ে এখন এক কল্প গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নীলাক্ষির জন্য তাঁর অন্তর দুঃখে দ্রবীভূত হলো। কিছুক্ষণ এইভাবে অধোবদনে বসে থাকবার পরেই তিনি ঘ্রাণে হিংস্র পশুর উপস্থিতি টের পেয়ে চকিত হলেন। দেখলেন, এখন আর কেউ বাইরে নেই। তিনি একলা। দূরে অন্ধকারে তাকিয়ে শ্বাপদের প্রজ্বলিত চক্ষু দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ উঠে, অগ্নি-

কুণ্ডের কাছে গিয়ে, খুঁচিয়ে আগুনের শিখা উসকিয়ে তুললেন। জ্বলন্ত একটি কাঠের টুকরো নিয়ে তিনি চারপাশে তাকালেন। অগ্নিশিখার প্রভায় জ্বলন্ত শ্বাপদ চক্ষুগুলো দূরান্তরে আত্মগোপন করেছে। কিন্তু তারা প্রত্যাশায় আশেপাশেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। শাম্ব আশপাশ থেকে কাঠের টুকরো নিয়ে, অগ্নিকুণ্ড বিস্তৃত করলেন। জ্বলন্ত কাঠ ছড়িয়ে, নিজের চারপাশে ব্যূহের সৃষ্টি করলেন, এবং নিশ্চিন্ত হয়ে উপবেশন করলেন। এখন শুধু নক্ষত্ররাজি অতি ধীরে আকাশের কক্ষপথে গমন করছে। নদীস্রোতে নক্ষত্রেরই রেখা মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে, আর কলকল ধ্বনি ভেসে আসছে।

শাম্ব নদীর দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

অতি প্রত্যূষে, অন্ধকার বিদায় নেবার আগে, যখন গাছে পাখীর প্রথম স্খলিত জিজ্ঞাসু ডাক শোনা গেল, শাম্ব তখন চন্দ্রভাগার বেগবতী শীতল স্রোতে অবগাহন করলেন। জলের ধারা যেন তাঁর দেহের গভীরে প্রবেশ করে, অন্তরস্থল পর্যন্ত ধৌত করে দিল। তাঁর মন ও প্রাণ যেন গভীর এক আনন্দানুভূতিতে ভরে উঠলো। স্নানের শেষে তাঁর একমাত্র সম্বল দ্বিতীয় বস্ত্রখণ্ডখানি দেহে জড়িয়ে, ভেজা বস্ত্র নিংড়ে, গা মাথা মুছলেন।

আকাশের পূব দিগন্ত ক্রমে রক্তিম হয়ে উঠছে। শাম্ব দেখলেন, পাতার কুটিরে বা মৃত্তিকা গহ্বরের কেউ এখনো জাগে নি। তিনি এদের সঙ্গে এখন আর দেখা করতে চাইলেন না। বরং তারা জেগে ওঠে, এই আশংকায় তিনি দ্রুত পূর্বদিকে গমন করলেন।

অনতিঘন অরণ্যানী ও বনস্পতির ফাঁকে ফাঁকে একটি মন্দিরের আকৃতি দেখা গেলেও, তার দূরত্ব যে কিছু কম, তা মনে হলো না। সেই মন্দিরের কিঞ্চিৎ দর্শনে, শাম্ব তাঁর হৃদয়ে এক রকমের ব্যাকুলতা বোধ করলেন, এবং যথাসম্ভব দ্রুত অগ্রসর হলেন। ক্রমেই পাখীদের স্খলিত স্বর স্পষ্ট ও সরব হয়ে উঠতে লাগলো। দেখলেন, যে অঞ্চলকে নিতান্ত অরণ্যানী মনে করেছিলেন, তা নানা ফুলে ফলে সুশোভিত এক সুবিশাল রমণীয় কানন। তাঁর মনে হলো, জীবনের বাকি দিনগুলো এমন রমণীয় কাননে কাটিয়ে যেতে পারলেও, তাঁর অভিশপ্ত প্রাণ অনেক শান্তিতে মৃত্যুকে বরণ করতে পারবে।

শাম্ব যতোই মন্দিরের নিকটবর্তী হলেন ততোই যেন কাননের শোভা অধিকতর রমণীয় হয়ে উঠতে লাগলো। মন্দিরের আকৃতি ও বিবিধ দেবতা যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরাদের মূর্তি, প্রায়ই চোখের সামনে ভেসে উঠলো। পূর্বের আকাশ ক্রমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর সিন্দুরের মতো লাল হয়ে উঠলো। তাঁর ডান দিকে বেগবতী চন্দ্রভাগার বুকে যেন রুধিরের তরল স্রোত বয়ে চলেছে। নদীর কলকল, বাতাসের মৃদু শনশন, পাখীর সুমিষ্ট ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। শাম্বর মনে হলো, মানুষের সমাজ সংসার ছাড়িয়ে, তিনি যেন এক অপার্থিব মায়াময় স্থানে পেঁছেছেন। এখানে কি প্রকৃতই সেই অত্যুজ্জ্বল পুরুষ পরমাত্মা অবস্থান করেন?

শাম্বর মনে এই চিন্তার উদয়মাত্রই তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হলো। কারণ মহর্ষি কথিত সেই অত্যুজ্জ্বল মূর্তির এক কল্পনা তাঁর অন্তরে গ্রথিত হয়ে আছে। তিনি নদীর তীরবর্তী মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন।

যথার্থ দক্ষিণে বলা যায় না, দক্ষিণ পূর্ব কোণে এবং একটি বৃহৎ রথের ন্যায় মন্দিরের গঠন। দ্বার আছে, কিন্তু কোনো প্রাচীরের দ্বারা মন্দিরটি বেষ্টিত নয়। রথের ন্যায় মন্দিরের চারদিকে চারটি দ্বার, পিঙ্গলা-দণ্ডনায়ক, রাজ্ঞা ও স্তোশ্রা, কালমাস-পক্ষীন, ভিওমান, ও নগ্নদিণ্ডি, দ্বারপালগণ রয়েছেন। অপ্সরা-গণ রথের বিভিন্ন অংশে নৃত্যে সঙ্গীতে ও বাদ্যযন্ত্রাদি বাদনের অপরূপ ভঙ্গিতে রয়েছেন। তাছাড়া দেবতাগণ, যক্ষ, গন্ধর্বগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীগণ, মারুতগণ সকলেই যথাস্থানে অবস্থান করছেন। মাথার ওপরে ছত্র, সেই আশ্চর্য পুরুষমূর্তি অবস্থান করছেন। শিরস্ত্রাণ তাঁর মস্তকে, কোমরবন্ধরূপে রয়েছে অভিয়ঙ্গ, পদতলের কনুইয়ের ঊর্ধ্ব পর্যন্ত পাদুকা শোভা পাচ্ছে।

শাম্বর অন্তরে গ্রহরাজের নানা বিস্ময়কর ও বিচিত্র কাহিনী উদিত হলো। তিনি আভূমি নত হয়ে, সেই পুরুষমূর্তিকে প্রণাম করলেন, ভাবলেন, এই কি নারোদোক্ত সেই সূর্যক্ষেত্র? তবে কেমন করে এই সর্বদেবমান্য পরমাত্মাকে আমি আরাধনা করবো? তাঁর তুষ্টিবিধান করে, শাপমুক্ত হবো? তিনি কি মূর্তিমান-রূপে আমার সামনে কখনো দেখা দেবেন? কেমন করে তাঁর আশীর্বাদ পাবো? তিনি কি আমাকে সেই ব্রহ্মরূপ শব্দের দ্বারা, শাপমোচনের নির্দেশ দেবেন? এই চিন্তা ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তরে যেন এক গভীর কল্পবোধ দৃঢ়তর হলো। তিনি সেই পরমাত্মার দুই পাশে তাঁর দুই পত্নী, রাজ্ঞি ও নিক্ষুভাকে দেখলেন। সকলেই যেন তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে আছেন। শাম্বর অন্তর বারে বারে শিহরিত হতে লাগলো।

এইরূপ চিন্তার মধ্যে, শাম্ব চারটি দ্বার প্রদক্ষিণ করে আবার নদীতীরে এসে দাঁড়ালেন। এই সময়ে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। দেখলেন, পূর্বাকাশব্যাপী রক্তাভার মধ্যে এক বিশাল সিন্দুর গোলকের ন্যায় সূর্য উদিত হচ্ছেন। একজন উজ্জ্বলবর্ণ পুরুষ, তাঁর সারা গায়ে জল, শুভ্র কেশ ও গুম্ফ ও শ্মশ্রু বিন্দু বিন্দু জলে চিকচিক করছে। সামান্য একখণ্ড সিক্ত ধুতি তাঁর পরি-ধানে। সদ্যোত্থিত সূর্যের আভায় সেই পুরুষের সর্বাঙ্গ যেন রক্তিম দেখাচ্ছে। তিনি নদীতীরে দাঁড়িয়ে, চোখ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আছেন। তাঁর করজোড় দুই হাত সূর্যের প্রতি প্রসারিত। তিনি কি কোনো মন্ত্রোচ্চারণ করছেন? কিন্তু তাঁর ঠোঁট নড়ছে না। কী করে তিনি রক্তবর্ণ তেজোদৃপ্ত সূর্যের দিকে অপলক দৃষ্টিপাত করে আছেন? শাম্বর ধারণা, এইরূপে মানুষের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই সদ্যোস্নাত উজ্জ্বল পুরুষের চোখে কোনোরকমে বিকার দেখা যাচ্ছে না।

শাম্ব সহসা তাঁর সামনে গেলেন না। অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভাবলেন ইনিই কি সেই ব্যক্তি, যাঁর কথা গত রাত্রে হতমান অবিশ্বাসী ব্যাধিগ্রস্তরা বলছিল? কে ইনি? প্রকৃতই কি একজন ঋষি, যিনি সর্বদা রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে সূর্যকে বেদোক্ত ভাষায় বন্দনা করেন? মহর্ষি নারদ বলেছিলেন, ঋষিগণ সে স্থানে বেদোক্ত প্রার্থনাদি আবৃত্তি করেন।

শাম্বর এই ভাবনার মধ্যেই সেই পুরুষ দুই হাত দিয়ে তাঁর দুই চোখ ধীরে মার্জনা করলেন। তারপর তীরের উচ্চভূমিতে উঠে, মন্দিরের দিকে না এসে, উত্তরদিকে গমন করলেন। শাম্ব যেন চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণে সেই পুরুষের পশ্চাতে অনুসরণ করলেন। মৃদুমন্দ বাতাসে নানা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। পাখীরা যেন সদ্যোত্থিত সূর্যকে বন্দনা করে গান করছে। কিছুদূর যাবার পরে

রমণীয় কানন মধ্যে একটি কুটির ও তপোবন দেখা গেল। শাম্ব সেই পুরুষকে আর অনুসরণ করতে যখন দ্বিধাগ্রস্ত, তখনই তিনি পিছন ফিরে শাম্বর দিকে তাকালেন। শাম্বর মনে হলো, রৌদ্রালোক তাঁকে অত্যুজ্জ্বল করেছে। আর অগ্রসর না হয়ে সেখান থেকেই, নতজানু হয়ে, সেই পুরুষকে আভূমি প্রণাম জানিয়ে বললেন, 'হে মহাভাগে অত্যুজ্জ্বল পুণ্যদেহ! আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। আপনাকে আমি নদীতীরে সূর্য নমস্কার করতে দেখেছি। অন্তরে যথেষ্ট দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও, আমাকে যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি আপনার প্রতি আকর্ষণ করলো। আমি আপনাকে অনুসরণ না করে থাকতে পারলাম না। হে মহাতপাঃ, আপনি আমাকে মার্জনা করুন।'

সেই পুরুষ প্রস্তরমূর্তির মতো অপলক চোখে শাম্বর দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিছুই বললেন না। তাঁর অপলক চোখের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ম ও অন্তর্ভেদী। শাম্বর মনে হলো, তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই পুরুষ যেন তাঁর সমুদয় বিষয় অবগত হলেন। তথাপি শাম্ব এই তপোধনের অসন্তুষ্টির আশংকায় হাত জোড় করে আবার বললেন, 'মহাত্মন, আপনাকে অশেষতেজঃপ্রভাযুক্ত দেখছি। আমি মহাব্যাধি আক্রান্ত অভিশপ্ত। এই মহাক্ষণে আপনার দৃষ্টিকে আমি হয়তো আহত করেছি। আপনার পবিত্র অন্তরের শান্তিকে বিঘ্নিত করেছি! আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি যেন এক অলৌকিক আকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আপনাকে অনুসরণ করেছি। আপনি আমাকে অজ্ঞ জ্ঞানে ক্ষমা করুন।'

শাম্বর কথা শেষ হতেই অদূরে বহুকণ্ঠের কোলাহল শোনা গেল। পুরুষমূর্তি বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো।'

শাম্ব যেন নিজের শ্রবণকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। সদ্যোস্নাত উপাসক যে তাঁকে এক কথায় আহ্বান করবেন, এ কথা তিনি ভাবতে পারেন নি। মহাপ্রভঃ ঋষি আবার পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করেছিলেন। শাম্ব তাঁর অন্তরে গভীর আস্থা অনুভব করে দ্রুত পায়ে ঋষিকে অনুসরণ করলেন। দূরে দক্ষিণের কোলাহল শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর সমব্যাধিগ্রস্ত সেই সব পুরুষ রমণী বালক-বালিকারা বোধহয় নদীর জলে স্নান করছে। তারপরে মন্দিরে নমস্কার করে সদলে সবাই ভিক্ষে করতে বেরোবে।

ঋষি পুরুষ কুটির প্রবেশে উদ্যত হয়ে থমকিয়ে দাঁড়ালেন, পিছনে ফিরে তাকালেন। শাম্ব আগেই অনেকখানি দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রভাযুক্ত পুরুষ বললেন, 'তুমি তপোবন মধ্যে মুক্ত রৌদ্রে কোথাও বসো। তুমি স্নান করে এসেছো, দক্ষিণ-পূর্ব হয়ে বসো। অল্পক্ষণেই আমার পূজা সাঙ্গ হবে। তারপরে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো।' এই বলে তিনি কুটির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

শাম্ব প্রতিটি নির্দেশই যথাবিহিত পালন করলেন। তিনি ফুল-ফল সুশোভিত তরুবীথির ছায়া পরিত্যাগ করে দক্ষিণ-পূর্বে মুখ করে মুক্ত রৌদ্রে উপবেশন করলেন। এ স্থানমাহাত্ম্য কিনা তিনি বুঝতে পারলেন না, যুগপৎ তাঁর অন্তরে এক অনুশোচনা ও অনির্বচনীয় আনন্দবোধ তরঙ্গায়িত হতে লাগলো। অনুশোচনা এই কারণে, তিনি এমন আশ্চর্য রমণীয় তপোবনে কখনো একান্ত একলা বসেন নি। এর মধ্যে যে এক মহত্তর আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধ বিরাজ করছে, আগে কখনো অনুভব করেন নি। ভোগ, বীরত্ব, শত্রুনিধন, ক্ষাত্রিয় ধর্মপালন এসবই তিনি জানতেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার স্বরূপ অনন্য। কেন তিনি আগেই এই অনন্য

সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন নি! এই অনুশোচনা তাঁর মনে জাগছে, এবং এক অনির্বচনীয় আনন্দের ধারা প্রতি মুহূর্তে তা ধৌত করে দিচ্ছে।

নারদোক্ত বৃষ্ণিব্যাঘ্র যে-ভাবে বসেছিলেন, সূর্য তাঁর মুখোমুখি ছিলেন না, অথচ সর্বাঙ্গে রৌদ্র স্পর্শ করছিল। তিনি নদী, পরবর্তী তীর এবং দূরের আকাশে তাকিয়ে রইলেন, এবং ক্রমে এক ভাবাবেশে তিনি চোখ মুদ্রিত করলেন। তাঁর চোখের সামনে কুসুমের বর্ণ দুলতে লাগলো। কতোক্ষণ তিনি এভাবে ছিলেন, অনুমান করতে পারেন না। হঠাৎ শুনলেন, 'এই নাও, এই ফলমূলাদি খাও। যৎসামান্য মিষ্টি খেয়ে জলপান করো।'

শাম্ব সংবিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুত গাত্রোত্থানে উদ্যত হলেন। সেই প্রভাযুক্ত ঋষি তাঁর সামনে জলপদ্মের পাতায় ফলমূল মিষ্ট নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শাম্বকে গাত্রোত্থানে উদ্যত দেখে, নিরস্ত করে বললেন, 'তোমাকে উঠতে হবে না। যেখানে বসে আছো, সেখানেই বসো। এই নাও, এই যৎসামান্য ফলমূলাদি খাও। তুমি নিশ্চয় ক্ষুধার্ত। তার আগে একবার গ্রহরাজকে প্রণাম করো।'

শাম্ব সূর্যকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন। তারপরে ঋষির প্রতি হাত প্রসারিত করলেন। ভেবেছিলেন, প্রভাযুক্ত ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই জলপদ্মের পাতা তাঁর দিকে ছুঁড়ে দেবেন। কিন্তু তিনি তা আদৌ করলেন না। যেমনভাবে একজনকে পাতায় খাদ্য পরিবেশন করতে হয়, তেমনি ভাবেই শাম্বর সামনে তা ভূমিতে রাখলেন। তাঁর বাঁ হাতে ছিল একটি মৃত্তিকার জলপূর্ণ পাত্র। সেটিও পাতার পাশে রাখলেন, বললেন, 'খাও। আমি বসছি। তোমার খাওয়া হলে, বৃত্তান্ত শুনবো।'

শাম্বর হৃদয় অতি আকুঞ্চিত হয়ে, নিশ্বাস অতি গভীরে আবর্তিত হলো, এবং মনে হলো, তাঁর চোখ ফেটে জল আসবে। হতভাগ্যের মতো অনেকগুলো দিন অতিবাহিত করবার পরে এইরকম প্রভাযুক্ত একজন উজ্জ্বল ঋষি পুরুষ তাঁকে স্বহস্তে খাদ্য পরিবেশন করলেন, সুবাক্য বললেন, এবং তাঁর মুখের অভিব্যক্তিতে বিন্দুমাত্র ঘৃণার কুঞ্চন দেখা গেল না। তিনি যেন একজন বিকলাঙ্গ কুৎসিত কুষ্ঠরোগগ্রস্তের সামনে নেই, এমনই স্বাভাবিক, বরং তার অধিক, শান্ত সৌম্য তাঁর মুখভাব, আচরণ আশ্চর্য অনায়াস ও ভব্যযুক্ত।

শাম্ব অতি কষ্টে তাঁর হৃদয়াবেগ দমন করলেন ও অশ্রুসংবরণ করলেন। দেখলেন তাঁর কপালে চন্দ্রভাগা তীরের মৃত্তিকারই একটি গোলাকার ফোঁটা চিহ্ন। মাথায় সুদীর্ঘ চুলে এক খণ্ড বস্ত্র জড়িয়ে চূড়ার মতো বাঁধা। তাঁর শুভ্র শ্মশ্রু যেন উজ্জ্বল রৌপ্যের ন্যায়, মুখমণ্ডলে সুবর্ণ দীপ্তিতে কোথাও বার্ধক্যের বলিরেখা পড়েনি। ইনিই প্রকৃত মহর্ষি নারদোক্ত অত্যুজ্জ্বল পরমাত্মা গ্রহরাজ নন তো? কায়ারূপ ধারণ করে শাম্বকে আচ্ছন্ন করছেন না তো?

প্রভাযুক্ত পুণ্যদেহধারী আবার বললেন, 'খাও। খাওয়া হলে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো।'

শাম্ব আবার করযোড়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে, ফল মুখে দিলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় মধ্যে সেই আবর্ত বারে বারে আকুঞ্চিত হতে লাগলো এবং চোখ জলে ভরে উঠতে চাইলো। তিনি নিজেকে অতি কষ্টে সংবরণ করলেন, এবং অমৃতবৎ ফলমূলাদি খেতে লাগলেন। প্রভাযুক্ত ঋষি নিকটেই একটি আমলকী বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন এবং নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাম্ব দুগ্ধজাত মিষ্টি খেয়ে, জলপান করলেন। ঋষি তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমাকে আমি গতকাল এখানে দেখিনি।'

শাম্ব বললেন, 'আমি গত সন্ধ্যায় এখানে এসে পৌঁছেছি।'

ঋষি পুরুষ বললেন, 'তোমাকে দেখে, আমি সেইরকমই অনুমান করেছি। কিন্তু এখানে তোমার মতো যারা আসে, তারা সকলেই জীবনের প্রতি বিশ্বাসহীন বীতশ্রদ্ধ অসংযমী হয়ে যায়। তাদের কথাবার্তা আর পূর্বের সুস্থ জীবনের মতো থাকে না। আচরণও বদলে যায়। তোমাকে আমি তার ব্যতিক্রম দেখলাম।'

শাম্ব বললেন, 'আমি সাত ঋতু অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছি। আমি শত শত গ্রাম জনপদ ও নগরীর মধ্যে দিয়ে এসেছি। অধিবাসীদের আমাকে দেখে ভয় ও ঘৃণার জন্য, তাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র রাগ হয় নি। আমি নিজেকে দিয়েই তাদের মনোভাব বিচার করেছি। তথাপি তারা আমাকে খেতে দিয়েছে। দুরন্ত বর্ষায়, তীব্র শীতে, খামারে গোয়ালের ধারে বহির্বাটির মাথাঢাকা দাওয়ায় থাকতে কোনো বাধা দেয়নি। সারমেয়কুল সর্বত্রই একরকম এবং অবোধ বালক-বালিকাগণও। তারা আমাকে নানাভাবে তাড়না করেছে, পীড়ন করেছে। কিন্তু আমি রাগ করি নি। পরমাত্মার কাছে তাদের সুমতির প্রার্থনা করেছি। তবে হে মহাত্মন, গৃহত্যাগ করার পরে, আপনার মতো দয়াময় ব্যক্তির সাক্ষাৎ আমি এই প্রথম পেলাম; তাতে আমার এই প্রত্যয় জন্মেছে, হয়তো আমি সিদ্ধিলাভ করতে পারবো।'

'সিদ্ধিলাভ? কিসের সিদ্ধিলাভ?'

'শাপমোচন।' কথাটি উচ্চারণ করেই, শাম্ব যেন সহসা বিব্রত বোধ করে আবার বললেন, 'আরোগ্যলাভই আমার সিদ্ধি।'

প্রভাযুক্ত ঋষি কয়েক মুহূর্ত শাম্বর দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই স্থানের কথা তোমাকে কে বলেছে, কী বলেছে?'

শাম্ব এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললেন, 'যিনি সকল বর্ষসমূহ ও অন্তরীক্ষ ভ্রমণ করেছেন, সেই মহর্ষি নারদ।'

'নারদ!' প্রভাযুক্ত পুরুষ বিস্মিত স্বরে উচ্চারণ করলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় তোমার সঙ্গে মহর্ষির সাক্ষাৎ হয়েছিল? তোমার পরিচয়ই বা কী?'

শাম্ব মৌনাবলম্বন করে মাথা নত করলেন। প্রভাযুক্ত পুরুষ তীক্ষ্ণ চোখে শাম্বকে দেখলেন, কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হলেন না, বরং কোমল স্বরে বললেন, 'পরিচয় দিতে যদি কুণ্ঠা থাকে, তবে থাক। হয়তো এই তোমার উপযুক্ত কাজ।'

শাম্ব প্রকৃতই কুণ্ঠাবোধ করছিলেন। তিনি যে বাসুদেবতনয়, এই পরিচয় দেওয়ার অর্থ এক সুদূরপ্রসারী কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করা। একমাত্র বংশপরিচয়ের দ্বারা অপরের উৎসাহকে তিনি বৃদ্ধি করতে চান না। কিন্তু এই মহাত্মা এ কথা কেন বললেন, 'হয় তো এই তোমার উপযুক্ত কাজ?' শাম্ব বললেন, 'আপনি আমাকে মার্জনা করবেন, অসন্তুষ্ট হবেন না। এখন আমার একমাত্র পরিচয়, আমি অভিশপ্ত। শাপমোচনের দ্বারা মোক্ষ লাভই আমার লক্ষ্য।'

প্রভাযুক্ত ঋষি বললেন, 'বুঝেছি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে মহর্ষি নারদ তোমাকে কী বলেছিলেন, কী নির্দেশ দিয়েছেন তা আমি শুনতে চাই।'

শাম্ব নির্দ্বিধায় নারদোক্ত সূর্যক্ষেত্র ও তার বর্ণনাদি এবং এখানে আগমন করে চন্দ্রভাগায় স্নান ইত্যাদি সব কথাই বললেন। তাঁর গতকাল অতিসায়াহ্নে আগমন, হতমান অবিশ্বাসী রোগগ্রস্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও রাত্রিবাসের বর্ণনা দিলেন এবং তারা এই প্রভাযুক্ত ঋষির বিষয়ে কী বলেছে, তাও বললেন। বর্ণনা

দিলেন, আজ অতি প্রত্যুষে চন্দ্রভাগায় স্নান করে, সূর্যক্ষেত্র দর্শনের পর, মহাত্মার দর্শন, এই রমণীয় কানন ও তপোবন তাঁর মনে কী গভীর শান্তি ও অনির্বচনীয়তা এনে দিয়েছে। তিনি বারে বারে মহাত্মার প্রশস্তি করে বললেন, 'আপনি যদি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ না হন, তা হলে এক বিষয়ে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

প্রভাযুক্ত ঋষি প্রসন্ন মুখে বললেন, 'একটা কেন, তোমার যা জিজ্ঞাস্য আছে, করো। আমি সাধ্যমত জবাব দেবো।'

শাম্ব বললেন, 'আমি দেখলাম, আপনি সূর্যদেবকে নমস্কার করে, কুটিরে গমন করলেন। মন্দিরের বিগ্রহকে তো আপনি পূজা করলেন না?'

ঋষি হেসে বললেন, 'তুমি গতকালই রাত্রে, আস্তানার কুষ্ঠরোগীদের কাছে শুনেছো, মন্দিরের বিগ্রহের পূজা হয় না। আমার ওই পরমাত্মা বিগ্রহকে পূজা করার কোনো অধিকার নেই। বেদ বলেছেন, গ্রহরাজ সূর্য সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য। বেদে আমার অধিকার থাকলেও বিগ্রহপূজা সকল শ্রেণীর দ্বারা সম্ভব না। বিশেষত আমি দেবলক ব্রাহ্মণ, আমার বিগ্রহ পূজা নিষেধ। কিন্তু আমি এই মিত্রবনে বাস করি, অতি প্রাচীনকাল থেকে এ স্থান সূর্যলোক নামে খ্যাত, আমি প্রতিদিন গ্রহরাজেরই পূজা করি। প্রাচীনতম কালে যখন এই গ্রহরাজের কোনো মূর্তি কল্পনা করা হয় নি, তখন একটি রক্ত মণ্ডলাকার অঙ্কনদ্বারা সর্বত্র তাঁর উপাসনার প্রচলন ছিল। আমি প্রতিদিন একটি মণ্ডলাকার অঙ্কন করে সাবিত্রের উপাসনা করি।'

শাম্ব নতুন বৃত্তান্ত শুনে অবাক হলেন, তাঁর কৌতূহল বর্ধিত হলো। তিনি বললেন, 'মহাত্মন্, মহর্ষির কথা শুনে আমি ভেবেছিলাম এখানে এসে আমি গ্রহরাজকে কায়ারূপে দর্শন করবো। এখন বুঝতে পারছি, আমি মহর্ষির কথা অর্বাচীনের ন্যায় ভেবেছি। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে বলুন এই গ্রহরাজের মূর্তি কী ভাবে, কবে থেকে মন্দিরে বিগ্রহের ন্যায় কল্পিত হয়েছিল?'

ঋষি প্রীত হয়ে বললেন, 'যে সব মহাপুরুষগণ এই পৃথিবী নামক গ্রহকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থাপ্রাপ্ত হতে দেখেছেন, তাঁরা বলেছেন, এই গ্রহরাজ আদি ও অনন্ত। তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা এবং নিয়ন্তা। তিনি ভয়ংকর কিন্তু শান্ত। তিনি প্রচণ্ড অগ্নিময়, কিন্তু জীবের জীবনধারণের কারণ। আমরা বিভিন্ন রূপে তাঁকে পূজা করেছি, বিভিন্ন নামে তাঁকে অভিহিত করেছি। আমাদের স্বভাব এইরকম যে যাকে আমরা ঈশ্বর রূপে ধ্যান করি, তাঁকে নিজেদের মনোমতো একটি রূপ দিতে চাই। সেই রূপ হওয়া চাই অতি তেজোদৃপ্ত, মহাবলশালী, অতি ক্ষমতাসম্পন্ন। গ্রহরাজের এক নাম আমরা দিয়েছি, 'বিবস্বান'। কে এই বিবস্বান, তুমি কি জানো?'

শাম্ব অতিশয় চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'আমি সূত মুখে এক অতি পরাক্রান্ত গন্ধর্বরাজ বিবস্বানের নাম শুনেছি। তিনি ছিলেন এই ভারতবর্ষ ও ইলাবৃত-বর্ষের মধ্যস্থল পর্বতের অন্তরীক্ষবাসী। তাঁর সন্তানগণের নাম বৈবস্বত মনু, যম, যমী, সাবর্নি মনু আর অশ্বিদ্বয়। আমি আরো শুনেছি, এই মহাবল গন্ধর্বরাজ চাক্ষুষ মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইক্ষ্বাকু এই বিবস্বানেরই বংশধর ছিলেন। পরবর্তীকালে এই ইক্ষ্বাকু রাজের বংশধরেরা সূর্যবংশীয় নামে খ্যাত ছিলেন।'

ঋষিপুরুষ অতি প্রসন্ন ও বিস্মিত মুগ্ধ চোখে শাম্বর দিকে তাকিয়ে বল-

লেন, 'তুমি পরিচয় না দিলেও, আমি ঠিকই অনুমান করেছি, তুমি কোনো খ্যাতনামা সম্ভবংশজাত; নিতান্ত অর্বাচীন নও। তুমি যা শুনেছো, আর মনে রেখেছো, তা অতীব সত্য। সেই গন্ধর্বরাজ বিবস্বান এমনই পরাক্রান্ত মহাবলশালী তেজোদৃপ্ত ছিলেন যে, সেই কালের লোকেরা তাঁকে গ্রহরাজ সূর্যের সঙ্গে তুলনা করতেন। কালে এমনই হলো, বিবস্বান বললে সূর্যকে বোঝায়, আবার রাজাকেও বোঝায়। সেই কারণেই ইক্ষ্বাকুবংশকে সূর্যবংশ বলা হয়। কিন্তু আমরা গ্রহরাজকে বিবস্বান নামে অভিহিত করলাম। তাঁর বহু নামের মধ্যে এইটি একটি। গ্রহরাজের বর্তমান যে-মূর্তি কল্পিত হয়েছে, তা গন্ধর্বরাজ বিবস্বানের ন্যায় হওয়া বিচিত্র নয়। বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের শিল্পীগণ অতিশয় পরিশ্রমী ও গুণী। তাঁরাই এই কল্পনাকে মূর্তির রূপদান করেছেন। তাঁরা বিবিধ যন্ত্রের ব্যবহার জানেন। তাঁদের চাক্ষুষ সৃষ্টি মানুষের মনে মায়ার সঞ্চার করতে সক্ষম।'

শাম্ব বিস্মিত ও উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'আমি আপনার কথার সমুদয় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছি। এখন আমি জানতে ইচ্ছা করি, এখানে কে এই সূর্যক্ষেত্র সৃষ্টি করলেন, মন্দিরই বা কার সৃষ্টি? এই পরম রমণীয় কাননই বা কে সৃষ্টি করেছেন?'

ঋষি বললেন, 'আমি যাবতকাল এখানে এসে বাস করছি, তখন থেকেই **এসব** দেখছি। আমাদের বংশে চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। আমি আমার পূর্বপুরুষগণের কাছে শুনেছি, এই স্থানকে গ্রহরাজের মূলস্থান বলা হয়। আরো শুনেছি, গ্রহরাজের এটি অস্তাচলমানস্থান। তিনি যখন এই ভূমণ্ডলের চক্রে অন্য পৃষ্ঠে আলোক দান করেন, তখন এখানে তাঁর শেষ কিরণের একটি গুণ কার্যকরী হয়।'

শাম্ব সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'দয়া করে আমাকে বলুন, শেষ কিরণের সেই গুণ কী? অস্তাচলমানস্থানই কী? কাকেই বা মূলস্থান বলে?'

ঋষি বললেন, 'এই ক্ষেত্রকে মূলস্থান কল্পনা করা হয়েছে। অস্তাচলমানস্থান বলা হয়, কারণ, গ্রহরাজ যখন ত্রিগুণ সীমাতিক্রান্ত হোন তখন তিনি 'পুরুষ' রূপে অভিহিত হন। তাঁর সেই অস্তাচলাভব বিবিধ চর্মরোগ, দেহের বিকৃতি বিনাশ করে। আমি অস্তাচলগামী গ্রহরাজের পূজা প্রতিদিন স্নানাদি শেষে করে থাকি।'

শাম্বর অন্তর আশার আলোয় উদ্ভাসিত হলো। তিনি অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্রহরাজের কিরণের কি এরূপ আরো স্থান ও কাল বিভাগ আছে?'

ঋষি পুরুষ বললেন, 'আছে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তোমাকে বলছি। এই মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে লবণদধি তীরে উদয়াচলে তিনি প্রথম আবির্ভূত হন। সেখানে তিনি পূর্বোত্তর কোণে উদিত হন, সেজন্য তাঁকে সেখানে কোণাদিত্য বলা হয়। এই আদ্যস্থানে তিনি পশ্চিম দক্ষিণে অস্তাচলে যান। যমুনার দক্ষিণ ভাগে দ্বারকার নিকটবর্তী স্থানে তিনি মধ্যাহ্নে অবস্থান করেন। তখন তিনি কালপ্রিয় নামে অভিহিত হন। মহাব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য, এই তিন স্থানে, তিন কালে তাঁর প্রভা অঙ্গে ধারণ করা বিধেয়।'

শাম্ব মনে মনে সংকট অনুভব করে, ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এক উদয় থেকে অস্তকালের মধ্যে, এই সুদূরবর্তী তিন স্থানে তিন কালে কী করে মানুষের পক্ষে গমনাগমন সম্ভব?'

ঋষি শাম্বকে আশ্বস্ত করে হেসে বললেন, 'সম্ভব না। সম্বৎসরে এই তিনকালকে ভাগ করে তিন স্থানে তোমাকে অবস্থান করতে হবে। আমিও করেছি।'

শাম্ব প্রভাষ্বস্ত ঋষিকে প্রণাম করে বললেন, 'আপনাকে দর্শনমাত্রেই আমি অনুভব করেছিলাম, আপনি অশেষগুণসম্পন্ন উজ্জ্বল পুরুষ। আপনি জ্ঞানী, মুক্ত পুরুষ। আপনার সান্নিধ্য অতি আনন্দদায়ক। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন আমি এই ত্রিক্ষেত্রে গমন করতে পারি।'

ঋষি স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করে বললেন, 'তোমার বিশ্বাসই তোমাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যাবে। তার আগে, তোমার আরো একটি বিশেষ পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হবে।'

'মহাত্মন, আমি শ্রমবিমুখ নই। আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, প্রাণপণে আমি তা পালন করবো।'

'আজ্ঞার বিষয় কিছু না, তোমারই কল্পকর্মের কথা আমি বলছি। যে-দ্বাদশ নামে গ্রহরাজ অভিহিত হয়ে থাকেন, আমি সেই নাম সকল বলছি। আদিত্য, সবিত্র, সূর্য, মিহির, অর্ক, প্রভাকর, মার্তণ্ড, ভাস্কর, ভানু, চিত্রভানু, দিবাকর, রবি। এই দ্বাদশ নাম এবং দ্বাদশ রূপে তিনি দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ তীর্থ ও নদ নদীতে, অতি ক্রিয়াশীল থাকেন। দ্বাদশ মাসে, দ্বাদশ দিন সেই সব নদ নদীতে স্নান ও রশ্মিযুক্ত হলে, ব্যাধির আরোগ্য ঘটে।'

শাম্ব ব্যগ্র কৌতূহলে জানতে চাইলেন, 'সেই দ্বাদশ তীর্থ ও নদ নদীর নাম আপনি দয়া করে বলুন।'

ঋষি বললেন, 'এই চন্দ্রভাগা তার মধ্যে একটি। এ ছাড়া, তোমাকে যেতে হবে পুষ্কর, নৈমিষ্য, কুরুক্ষেত্র, পৃথূদক, গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, নর্মদা, পয়িষ্ণনী, যমুনা, তাম্রা, ক্ষিপ্রা এবং বেত্রবতী। এই সমস্ত অঞ্চলই উত্তর অংশে, বিন্ধ্যপদে, দক্ষিণের উত্তরাঞ্চল সীমানায়। তুমি প্রত্যেক স্থানে একদিন অবস্থান করলেও, আমার মনে হয় ছয় ঋতু অতিক্রম করবে। সাত ঋতুতে তুমি এখানে পৌঁচেছো। আরো ছয় ঋতু এইভাবে পরিভ্রমণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব কী না তোমারই বিচার্য।'

শাম্ব অতি উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'মহাভাগে, আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি নিশ্চয়ই পারবো। আপনি আমাকে আর কিছু নির্দেশ দেবেন?'

ঋষি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি, প্রতি মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে গ্রহরাজের প্রভা উজ্জ্বলতর হয়। এই দিনটি উপবাস করা বিধেয়।'

শাম্ব দ্বিধা ভরে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহাত্মন্, আপনি বলছেন, 'আমি শুনেছি', আপনি হৃষ্ট মনে আমাকে জবাব দিন, কোথায় কার কাছে শুনেছেন? আপনার পূর্বপুরুষদের নিকট?'

ঋষি হাস্য করে মাথা নাড়লেন, বললেন, 'না। **তুমি দ্বাদশস্থান পরিভ্রমণ** করে আসার পরে, আমি তোমাকে নতুন বৃত্তান্ত বলবো।'

শাম্ব করযোড়ে বললেন, 'আমার মহাভাগ্য। আমি আপনাকে আর একটি কথা বলবো। আমি গতকাল অতি সায়াহ্নে যখন এখানে এলাম, টিলার মৃত্তিকা গহ্বরে ও পাতার কুটিরে ব্যাধিগ্রস্ত হতাশ অবিশ্বাসীদের দেখে, আমার অন্তর বিষাদে পূর্ণ হয়েছে। আপনার উপদেশ ওরা গ্রহণ করে নি। আমি এক হতভাগ্য, ওরা যেন আরো অধিক হতভাগ্য। আমি ওদের জন্য এতই বিচলিত বোধ করছি, কেবলই মনে হচ্ছে, ওরাও কি দ্বাদশ স্থানে যেতে পারে না? আরোগ্য লাভ করতে

পারে না? আমি কি ওদের সঙ্গে আহ্বান করতে পারি না?'

প্রভাযুক্ত ঋষি সহসা কোনো কথা বললেন না, অপলক নিবিড় চোখে শাম্বর মুখের দিকে তাকালেন। শাম্বর চোখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। শাম্বর ব্যাধিগ্রস্ত বিশাল শরীরের প্রতি লক্ষ করলেন। শাম্ব অন্যায় আশংকায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে উদ্যত হলে, তিনি হাত তুলে তাঁকে নিরস্ত করে বললেন, 'আমি তোমার কথায় বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, অত্যন্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যে-ই হও, আমার বিশ্বাস, তোমার শাপমোচন ঘটলে, তার সঙ্গে কোনো মহৎ কর্মেরও সাধন হবে। অন্যথায় এ চিন্তা তোমার মনে উদিত হতো না। ওই সব কুটিরের অধিবাসীদের প্রতি আমি বিমুখ নই। তোমাকে আমি যা যা বলেছি, ওদেরও তা বলেছি। হতভাগ্য অবিশ্বাসীরা মানে নি। তুমি যদি ওদের তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো, এক বিশাল জনসংখ্যা আস্তে আস্তে রোগমুক্ত হতে পারে। তুমি যদি ওদের সম্মত করাতে পারো, তা হলেই সার্থক।' এই বলে ঋষি বৃক্ষমূল থেকে গাত্রোত্থান করে বললেন, 'তুমি কাছেপিঠে যদ্‌চ্ছা ঘুরে বেড়াও। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে তন্ডুল ফলমূলাদি দেয়। এক গোপরমণী দুধ ও দুগ্ধজাত ক্ষীর মিষ্টান্ন দেয়। আমি দিনান্তে একবার স্ব-পাকে রান্না করি। অস্তগামী আদিত্যের পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণ করে, অন্নগ্রহণ করি। তুমিও আমার অন্নের ভাগ গ্রহণ করবে।'

শাম্ব আবার আভূমি নত হয়ে ঋষিকে প্রণাম করলেন। ঋষি তাঁর কুটিরে গমন করলেন। শাম্বও গাত্রোত্থান করলেন, কিন্তু বেশি দূরে কোথাও গেলেন না। চন্দ্রভাগা তীরে গিয়ে, জলের সামনে বসে, ঋষির কথিত কর্তব্যকর্ম বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। আর মনে মনে বললেন, 'হে বিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, তুমি আমাকে শক্তি দাও, শক্তি দাও।'

শাম্ব সূর্যাস্তের পরে, ঋষির পূজা শেষে, তাঁর কাছ থেকে অন্ন গ্রহণ করে, রাত্রের মতো বিদায় চাইলেন। ঋষি তাঁকে বললেন, 'তুমি এখন ওই টিলার গায়ে যাবে। সাবধানে থেকো। এই মিশ্রবনের কোথাও তুমি একটি কুটির নির্মাণ করে থাকো এই আমার ইচ্ছা। তবে তার আগে তুমি দ্বাদশস্থানে ঘুরে এসো, এবং সেই অবিশ্বাসীদের যদি সম্মত করাতে পারো, তার চেষ্টা পাও।'

শাম্ব ঋষিকে প্রণামপূর্বক বিদায় নিয়ে, নদীতীরের সেই বিস্তৃত টিলা অঞ্চলে উপস্থিত হলেন। অন্ধকার নেমে এসেছে। অগ্নিকুন্ডগুলো জ্বলছে, এবং সেই আলোয় দেখা গেল, পুরুষ-রমণীগণ বালক-বালিকাগণ ইতস্তত গুচ্ছ গুচ্ছ বসে আছে। দেখেই বোঝা যায়, তাদের রান্না খাওয়া সবে শেষ হয়েছে। তখনো কেউ কেউ খাচ্ছিল। শাম্বকে দেখে সবাই ব্যঙ্গাবিদ্রূপপূর্ণ বাক্যে কলরব করে উঠলো। একজন চিৎকার করে বললো, 'নীলাক্ষি, গতকালের সেই লোকটা ভোর রাত্রেই কোথায় চম্পট দিয়েছিল, আবার এখন ফিরে এসেছে। নিশ্চয়ই ও আজ তোমার খাবারে আবার ভাগ বসাতে এসেছে।'

'আজ হয়তো ও সারাদিন না খেয়ে বুঝেছে, নীলাক্ষির সঙ্গে থাকাই ভালো।' আর একজন বিদ্রূপ করে বললো।

একজন কাছে এসে বললো, 'তোমার সঙ্গে কি ওই ঋষি লোকটার দেখা হয়েছিল? নিশ্চয়ই অনেক জ্ঞান দিয়েছে?'

শাম্ব বললেন, 'উনি একজন প্রকৃত জ্ঞানী। তবে উনি আমাকে কিছু উপদেশ দিয়েছেন।'

শাম্বর আশেপাশে যারা ছিল, আর তাঁর কথা শুনতে পেলো, সবাই হই হই করে উঠলো, 'হতেই হবে, হতেই হবে। ও ব্যাটা যাকে পায়, তাকেই গুচ্ছের উপদেশ দেয়। তোমরা শোনো, একেও সেই ঋষি লোকটা অনেক উপদেশ দিয়েছে।'

শাম্ব গম্ভীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন, 'থামো। তিনি একজন প্রকৃতই জ্ঞানী। তাঁর সম্পর্কে তোমরা সংযত বাক্য উচ্চারণ করো।'

শাম্বর গম্ভীর অথচ দৃঢ় স্বরে এমনই একটি প্রত্যয় ছিল, সকলেই কেমন সচকিত বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালো। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললো না। কিছুক্ষণ পরে একজন বলে উঠলো, 'এ লোকটা রাজরাজড়া ঋষিদের মতো কথা বলে। এও নিশ্চয়ই আমাদের কোনো জ্ঞান দেবে।'

'না, আমি তোমাদের কোনো জ্ঞান দেবো না।' শাম্বর স্বর যেন গম্ভীর শঙ্খের নিনাদে ধ্বনিত হলো, 'আমি তোমাদের একটি মাত্র অনুরোধ করবো।'

সকলেই কিছুটা হতবাক বিস্ময়ে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। এই সময়ে নীলাক্ষি তার শিশুটিকে বুকে নিয়ে শাম্বর সামনে এসে দাঁড়ালো। তার ক্ষয়-ক্ষত স্ফীত ঠোঁটে বিস্ফারিত হাসি। শাম্ব শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'নীলাক্ষি, তোমার আজ ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়েছে তো?'

নীলাক্ষি ঠোঁট কুঞ্চিত করে বললো, 'ওসব পূর্ণটূর্ণ জানি না। ঝুলি কোনোদিনই ভরে না, লোকে ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করে আসে। কিন্তু তুমি কী যেন বলছিলে?'

'ও আমাদের কী একটা অনুরোধ করবে।' কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো, 'ওর ভাবগতিক মোটেই সুবিধের না। ও নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞান দেবার তালে আছে।'

শাম্ব দৃঢ় এবং কিছুটা তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'না, আমি তোমাদের কোনো জ্ঞান দেবো না। তোমরা ভুলে যাচ্ছো, আমিও তোমাদের মতোই মহাব্যাধিগ্রস্ত দুর্ভাগা অভিশপ্ত। তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো প্রভেদ নেই, প্রভেদ শুধু একটাই—।'

'যে তুমি ঋষি রাজরাজড়াদের মতন কথা বলো।' কয়েকজন বাধা দিয়ে বলে উঠলো।

শাম্ব সেই কয়েকজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না। প্রভেদ এই, তোমরা বিশ্বাস হারিয়েছো, আমি এখনো বিশ্বাস হারাই নি।'

'কিসের বিশ্বাস? আমাদের আবার কিসের বিশ্বাস থাকতে পারে?' সমস্বরে রমণী পুরুষ বলে উঠলো।

শাম্ব কয়েক মুহূর্ত প্রায় সকলের মুখের দিকে যেন আলাদা আলাদা করে তাকালেন, বললেন, 'আরোগ্যলাভের বিশ্বাস।'

'তখনই বলেছিলাম, লোকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা জ্ঞান দেবে!' কয়েকজন লাফালাফি করে বলে উঠলো, 'ও আমাদের বিশ্বাস করতে বলছে, আমরা ভালো হয়ে যাবো।'

সবাই নানা ইতর ভাষা উচ্চারণ করে, বিকৃত উচ্চস্বরে হাসতে লাগলো, আর ধিক্কারের ভঙ্গিতে বলতে লাগলো, 'মিথ্যা স্তোক, মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা।'.....

শাম্ব শান্ত ভাবে অপেক্ষা করলেন। যখন ওরা কিঞ্চিৎ শান্ত হলো, তখন তিনি বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরে শোন, আমরা সমগোত্রীয়, সকলেই সমান। সংসারের

সব মানুষ আমাদের কারোকে আলাদা চোখে দেখে না। আমার জীবনে যা সত্য, তোমাদের জীবনেও তা সত্য। তবে কেন তোমাদের আমি মিথ্যা কথা বলবো। তোমরা ব্যাধিগ্রস্ত হয়েও যদি সম্পদশালী হতে, তা হলে আমি তস্করের ন্যায় মিথ্যা কথা বলতে পারতাম, ছলনা করতে পারতাম। এক্ষেত্রে তারও কোনো সম্ভাবনা নেই।'

সকলের মধ্যে একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখা দিল। একজন বৃদ্ধা কাছ থেকে বললো, 'এটা ঠিক, আমাদের ঠকাবার কিছুই নেই। আর ও আমাদের মতনই একজন কুষ্ঠরোগী।'

'কিন্তু ও যে কী সব বিশ্বাস-ফিশ্বাসের কথা বলছে। ওসব তো মিথ্যা। ছলনা।' একজন বলে উঠলো।

শাম্ব বললেন, 'কখনোই না। যার বিশ্বাস হারায়, তার সবই হারিয়ে যায়।'

'আমাদেরও সবই হারিয়ে গেছে।' কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো, 'আমাদের আর কোনো কিছুতে বিশ্বাস নেই।'

শাম্ব বললেন, 'আমার সঙ্গে তোমাদের এই প্রভেদের কথাই বলছিলাম। আমি বিশ্বাস করি, আমার পাপই আমাকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে, আর একমাত্র মুক্তির উপায়, দুষ্কর প্রায়শ্চিত্ত। এই আমার বিশ্বাস।'

'কী সেই প্রায়শ্চিত্ত?' নীলাক্ষি জিজ্ঞেস করলো।

শাম্ব বললেন, 'আরোগ্যলাভের চেষ্টা। এসো, আমরা সবাই আরোগ্যলাভের চেষ্টা করি।'

সকলে সমস্বরে হই হই করে উঠতেই, নীলাক্ষি তীক্ষ্ণ স্বরে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'চুপ করো। ও আমাদের মতোই কুষ্ঠরোগী। ওর কথা আমাদের শোনা উচিত। ও কী বলে, আমরা শুনবো।'

শাম্ব চমৎকৃত বিস্ময়ে দেখলেন, নীলাক্ষির প্রতিবাদে এক অবিশ্বাস্য আশাতীত প্রতিক্রিয়া ঘটলো। নীলাক্ষির প্রতিবাদও যেন উপস্থিত সকলের কাছে আশাতীত বোধ হওয়ায়, তারা স্তম্ভিত স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। নীলাক্ষি শাম্বকে বললো, 'এসো, তুমি বসো, আমরাও বসি। তুমি কী বলো, আমরা শুনি। তোমার কথা যদি আমাদের মনে লাগে, ভালো। নইলে তোমাকে আর তোমার কথা আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেবো।'

শাম্বর মনে হলো। এ যেন সেই গত রাত্রের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রমণী না, যে অতি-প্রার্থিনী হয়ে তাঁকে উত্তম যুক্তির দ্বারা রমণে প্ররোচিত করেছিল। উত্তম যুক্তি ছিল তার কথায়, কারণ এই ব্যাধি এবং দেহের বহিরাবরণ ও অভ্যন্তরের অনুভূতি আর মানসিকতা বিষয়ে ওর বক্তব্যে কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এই রমণী যে এমন অঘটনঘটনপটিয়সী হতে পারে, তিনি অনুমানও করতে পারেন নি। তার কথার মধ্যে এখনো তেজ ও যুক্তি লক্ষণীয়। শাম্ব এদের সম্পর্কে যতোটা হতাশ হয়েছিলেন, ততোটাই আশান্বিত হলেন। তিনি নীলাক্ষির সঙ্গেই একটি অগ্নিকুণ্ডের অদূরে বসলেন। দেখা গেল, অনেকেই সামনে এসে বসলো। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে রইলো। যেন বন্যহস্তীযূথ এখনো পুরোপুরি নতি স্বীকার করতে পারছে না, অথচ বিদ্রোহও করতে পারছে না, এইরকম তাদের অবস্থা। তার মধ্যেই তিনি শুনতে পেলেন, কেউ কেউ বলাবলি করছে, 'নীলাক্ষি যখন বলছে, তখন শোনাই যাক, কী বলো হে! লোকটা আমাদের কেউ না হতে পারে, নীলাক্ষি তো আমাদের।'

শাম্ব দেখলেন, নীলাক্ষি এবং সকলেই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি বললেন, 'আমার যা বলবার, তা তোমাদের বলেছি। তবু আমি আবার তোমাদের বলছি, আমাদের সামনে জীবনের আর কী অবশিষ্ট আছে?'

'মরা মরা। পচে গলে মরা।' কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো।

শাম্ব দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'না। সুস্থ হয়ে বাঁচা। লয় ক্ষয় ও মৃত্যু অনিবার্য। স্বর্গলোকেও এই জীবনমৃত্যুর লীলা চলছে। যাঁরা মহৎ কর্মের দ্বারা দিবি অরোহণ করেছেন, তাঁরা নক্ষত্রলোকে বিরাজ করছেন। আমরা তাঁদের স্মৃতিচারণ করি, পূজা করি। কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য জেনেও আমরা সুস্থ সবল ভাবে বাঁচতে চাই। আমাদের সামনে জীবনের এইটাই একমাত্র অবশিষ্ট আছে।' বলে তিনি নীলাক্ষির কোল থেকে তার শিশুটিকে নিয়ে তুলে ধরে দেখিয়ে বললেন, 'এই সুন্দর শিশুটি কী অপরাধ করেছে যে, সে তার পিতামাতার ব্যাধি নিয়ে অকালে মরে যাবে? ওর অপরাধ কি এই, এই পৃথিবীতে ও জন্মেছে? নিজেদের আর ওকে, ওর মতো আমাদের এখানে আরো শিশুদের বাঁচিয়ে রাখার কোনো দায়িত্ব কি আমাদের নেই?'

সহসা কেউ কোনো জবাব দিল না, কিন্তু প্রতিবাদে চিৎকার করেও উঠলো না। শিশুটিও যেন বিশেষ কৌতুক ও আকর্ষণে শাম্বর দিকে তাকিয়ে রইলো, কেঁদে উঠলো না। শাম্ব আবার বললেন, 'ব্যাধি হলে, আরোগ্যলাভের নানা উপায় আছে। আমাদের সেই উপায় অবলম্বন করতে হবে। এখনো আমাদের আশা আছে। মনে বিশ্বাস থাকলে আমরা আরোগ্যলাভ করতে পারবো। এই সব শিশু বালক বালিকারাও সুস্থ হবে। বড় হয়ে ওরা তোমাদের জয়গান করবে।'

নীলাক্ষি বললো, 'ভালো হওয়ার কী উপায়?'

শাম্ব বললেন, 'হতাশ হয়ে, এক স্থানে পঙ্গুর মতো বসে থাকা না।' বলে তিনি ঋষি কথিত দ্বাদশ স্থান ও নদনদীর কথা বললেন।

কয়েকজন চিৎকার করে উঠলো, 'এ সেই ঋষি লোকটার কথাই বলছে।'

'কিন্তু ও নিজে আমাদের মতই একজন কুষ্ঠরোগী।' নীলাক্ষি উচ্চস্বরে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ও সুস্থ লোকের মতন আমাদের কেবল উপদেশ দিতে আসে নি। ও আমাদের সঙ্গে যাবে, ও আমাদের মতন একজন। আমি ওর সঙ্গে যাবো।'

তৎক্ষণাৎ কয়েকজন নীলাক্ষির কথার প্রতিধ্বনি করলো, 'হ্যাঁ, আমিও যাবো, আমিও যাবো। ও আমাদের মতনই একজন।'

একজন রুদ্ধ স্বরে শাম্বকে দেখিয়ে বলে উঠলো, 'ওকে আমার ছদ্মবেশী যক্ষ বলে মনে হচ্ছে। কুষ্ঠরোগী সেজে এসেছে, আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে যাবে।'

আর একজন মাটিতে লুটিয়ে কেঁদে বললো, 'হা ঈশ্বর, আমি কি আবার সত্যি ভালো হয়ে যাবো? একি আশ্চর্য কথা শুনছি?'

শাম্ব নীলাক্ষির কোলে তার শিশুটিকে তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভূলুণ্ঠিত ক্রন্দনমান লোকটিকে জড়িয়ে ধরে তুলে বললো, 'আশা রাখো, বিশ্বাস রাখো। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, সংসার প্রকৃতই বিস্ময়কর, ঘটনাবলী সকল আশ্চর্যজনক।'

'তা নইলে কেন আমাদের এই মহারোগ হবে?' নীলাক্ষি বললো, এবং শাম্বর দিকে তাকিয়ে আবার বললো, 'আমার মনে আশা জাগছে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের মনেও আশা জাগছে। তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি।' অনেকে সমস্বরে বলে উঠলো।

শাম্বর চারপাশে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা এসে দাঁড়ালো। শাম্ব সকলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। রমণীরা তাদের শিশুদের শাম্বর দিকে এগিয়ে দিল। শাম্ব শিশুদের কপালে মাথায় তাঁর অসাড় হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। ফিরে তাকালেন নীলাক্ষির দিকে। নীলাক্ষি এগিয়ে এলো। শাম্ব তার শিশুটিকে স্পর্শ করলেন। তাদের এই আচরণ যেন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের সঙ্কেত। কিন্তু নীলাক্ষির বিষয়ে তাঁর মনে তখনো একটি দ্বিধা ও সন্দেহ ছিল। তিনি আশংকা করছিলেন, নীলাক্ষি হয়তো গত রাত্রের মতোই, অভ্যস্ত বাসনায় রমণেচ্ছা প্রকাশ করবে।

নীলাক্ষি সেই মুহূর্তেই বলে উঠলো, 'কাল রাত্রে আমি তোমার ওপর অন্যায় রাগ করেছিলাম। তোমাকে এই কারণেই আমি আরো বিশ্বাস করি, তুমি আমাদের মতন হয়েও আমাদের থেকে তোমার মনের জোর বেশি। তুমি যেন কাল রাত্রের কথা মনে রেখে আমার ওপর রাগ করো না।'

শাম্বর অন্তর মুহূর্তের জন্য দুর্বল হলো। বহুদিন তিনি কোনো রমণীকে স্নেহ ও সোহাগ করেন নি। এখন মনে হলো, নীলাক্ষিকে তিনি সোহাগ ও আদর করবেন, তার বাসনা পূর্ণ করবেন। আবার ক্ষণ পরেই তিনি মনের দুর্বলতা দমন করলেন, বললেন, 'আমি কখনোই তোমার ওপর রাগ করি নি। বরং আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি দেখছি, তোমার মধ্যেও শক্তি আছে।'

নীলাক্ষির ভগ্ন নাসা, পুচ্ছহীন রক্তাভ চোখ, ক্ষয়-ক্ষত ঠোঁট, স্ফীত মুখে সলজ্জ হাসি ফুটলো। বললো, 'না না, আমার কোনো শক্তি নেই। আমি তোমার কাছ থেকেই শক্তি পেয়েছি। এবার বলো আমরা কবে কখন যাত্রা করবো।'

শাম্ব বললেন, 'শুভ কাজে বিলম্ব করতে নেই। আমরা সকলেই কল্প গ্রহণ করে, আগামীকাল প্রত্যুষে চন্দ্রভাগায় স্নান করে যাত্রা করবো।'

কেউ কেউ তাদের সংগৃহীত অতি সামান্য বস্তুর জন্য আর্তস্বরে বলে উঠলো, সে-সব কেমন করে তারা ফেলে যাবে? শাম্ব বললেন, 'এখানে সব যেমন আছে, তেমনই থাকবে। আমরা কেবল আমাদের এই দেহগুলো নিয়ে যাত্রা করবো। আর নিতান্ত ব্যবহার্য বস্তু সকল বহন করবো।'

'আজো আমার কিছু বাড়তি খাবার আছে।' নীলাক্ষি শাম্বকে বললো, 'তোমাকে এনে দিই, খাও।'

শাম্বর হৃদয় এক অনাস্বাদিত ব্যথায় ও আনন্দে ভরে উঠলো। বললেন, 'নীলাক্ষি, তোমার হৃদয় অতুলনীয়। এখানে আসার আগে, তপোবনের ঋষিই আমাকে তাঁর স্বপাক অন্ন খেতে দিয়েছিলেন। তোমার বাড়তি খাবার তুমি কাল স্নানের পরে খেও।'

'কিন্তু তুমি আজও কি চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে সারা রাত জেগে বসে থাকবে?' নীলাক্ষি উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

শাম্ব বললেন, 'না। আমি এখন তপোবনে যাবো। কাল প্রত্যুষে এসে তোমাদের জাগিয়ে তুলবো।'

এক বৃদ্ধা বললো, 'হ্যাঁ, তাই যাও। আমি শুনেছি ওই তপোবনে কোনো জন্তু জানোয়াররা হামলা করে না।'

শাম্ব রাত্রের জন্য সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর তপোবনে যাবার

প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, আগামীকাল প্রত্যুষেই সকলকে নিয়ে তাঁর যাত্রার কথা ঋষিকে জানানো। অবিশ্যি তিনি কুটির বন্ধ করে নিদ্রিত থাকলে তাঁকে জাগাবার কোনো প্রশ্নই নেই। তা হলে শাম্ব আজ রাত্রিটা মন্দির সংলগ্ন কাননে কোথাও কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু এই ঘটনায় তিনি এখনো বিস্ময় বোধ করছিলেন। তিনি একজন ক্ষত্রিয়। কোনো কার্য সমাধা করতে হলে অস্ত্র ও বাহুবলেই তিনি অধিকতর বিশ্বাসী। অথচ সমস্ত ঘটনাটি ঘটে গেল এক মানবিক আবেদনে। এ ক্ষেত্রে তিনি দেখলেন, নীলাক্ষিই তাঁর অস্ত্র স্বরূপ কাজ করলো।

শাম্ব মন্দিরের নিকটবর্তী হতেই, অন্ধকারে ঋষির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, 'তুমি বোধহয় আমার সন্ধানে যাচ্ছো?'

শাম্ব থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এই রমণীয় কানন অন্ধকার হলেও সবই যেন আবছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। ঋষির পিছনেই নদী ও নক্ষত্রখচিত আকাশ। শাম্ব তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। করজোড়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে শাম্ব বললেন, 'মহাত্মন্, আপনিই যথার্থই অনুমান করেছেন।'

'অনুমান না বৎস, আমি দূরের অন্তরাল থেকে সবই দেখেছি ও শুনেছি।' ঋষি শাম্বর কথা শেষের আগেই বলে উঠলেন, 'তোমার অভিপ্রায় শুনে, আমার অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মেছিল। প্রকৃতপক্ষে আমার মনে গভীর সন্দেহ ছিল। কিন্তু তুমি যে-ই হও, অশেষ তোমার ক্ষমতা। আমি আবার তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি শাপমুক্ত হও, তোমার অনুগামীরা সকলে আরোগ্যলাভ করুক। এখন আর বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নেই। এই কানন মধ্যে এক আশ্চর্য শাখা-বিস্তৃত বৃক্ষ আছে। একজন মানুষ অনায়াসে নিশ্চিন্তে সেখানে শয়ন করতে পারে। কোনো হিংস্র শ্বাপদ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এসো, তোমাকে আমি সেই বৃক্ষ দেখিয়ে দিই। কাল প্রত্যুষে যাত্রাকালে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

শাম্ব বুঝলেন, ঋষিপুরুষও শুভ কাজের মধ্যে আর কোনো আলাপাদি বা বিলম্ব করতে চান না। তিনি ঋষিকে অনুসরণ করলেন।

অন্ধকারে পাখীর প্রথম ডাকেই শাম্বর নিদ্রাভঙ্গ হলো। এ ডাক রাত্রিচর পাখীর, প্রভাতের প্রত্যাশায় ব্যাকুল স্খলিত জিজ্ঞাসু পাখীর স্বর। শাম্ব দেখলেন, পূর্বাকাশে ঈষৎ রক্তাভা জেগে উঠেছে। তিনি সেই খট্টিকার ন্যায় প্রশস্ত ও বিস্তৃত শাখাযুক্ত বৃক্ষ থেকে অবতরণ করে আগেই গেলেন সেই টিলা অঞ্চলে। তখনো সকলেই নিদ্রিত। শাম্ব যদি জানতেন নীলাক্ষি কোন্ কুটিরে বা মৃত্তিকা গহ্বরে বাস করে, তা হলে প্রথমে তাকেই ডাকতেন। তা জানা না থাকায় তিনি প্রতিটি কুটিরের সামনে, মৃত্তিকা গহ্বরের কাছে গিয়ে সবাইকে ডেকে তুললেন।

মুহূর্ত মধ্যেই সমস্ত অঞ্চলটি কোলাহলে পূর্ণ হলো। সকলেই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে চন্দ্রভাগার জলে স্নান করে নিল। শাম্বও তাদের সঙ্গে স্নান করলেন। পূবের আকাশে ক্রমেই অতি উজ্জ্বল রক্তাভা ছড়িয়ে যেতে লাগলো। শাম্বর নির্দেশে সকলেই দ্রুত প্রস্তুত হলো। ব্যবহার্য বস্ত্রাদি, খাবারের ও রন্ধনের পাত্রাদি ঝোলায় বেঁধে নিল। শাম্বর মনে পড়ে গেল, শাল্ব এবং অন্যান্য বীরদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা, কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামের চিত্র ভেসে উঠলো চোখের সামনে। আজও যেন তিনি যুদ্ধযাত্রা করছেন। এ যুদ্ধের রূপ আলাদা। তিনি আগেই স্থির করে রেখেছিলেন, চন্দ্রভাগার তীর ধরে উত্তরে গমন করবেন

এবং সিন্ধু ও চন্দ্রভাগার সঙ্গমে উপস্থিত হবেন। সিন্ধুর উৎপত্তিস্থল হিমালয়। চন্দ্রভাগা যে-স্থানে শাখা নদী রূপে অবতরণ করেছে, সে-স্থানও হিমালয়ের ওপরে।

নদীর তীর ধরে যাবার সময়ে, সেই প্রভাযুক্ত ঋষি, গতকাল যেখানে ভোরে দাঁড়িয়েছিলেন, এখনো সেখানেই প্রতীক্ষা করছিলেন। এখনো গ্রহরাজ উদিত হন নি। শাম্ব তাঁর সামনে গিয়ে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন। তাঁর সঙ্গের দল কখনোই ঋষিকে কোনোরকম শ্রদ্ধা দেখায় নি। আজ তারা কপালে করজোড় স্পর্শ করে, নানা জনে নানারকম মন্তব্য করলো। কেউ বললো, 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হলো হে ব্রাহ্মণ।'

কেউ বললো, 'আমরা ভালো হয়ে আবার এখানে আসবো।'

ঋষি দু হাত প্রসারিত করে সকলের শুভযাত্রা ও মঙ্গলকামনা করলেন।

শাম্ব যাত্রার আগেই গণনা করেছিলেন, শিশু থেকে বৃদ্ধ, নানা বয়সের নরনারী সর্বসাকুল্যে সত্তরজন ছিল। দ্বাদশ স্থানে ও নদনদীতে স্নান করে, দ্বাদশ মাস পরে তিনি যখন আবার চন্দ্রভাগাকূলে অস্তাচলমান স্থানে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে বাদ দিয়ে চৌদ্দজন মাত্র জীবিত। বাকি কিছু সংখ্যক লোক ব্যতিরেকে, সকলেই পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেছে। কেউ কেউ ব্যাধির অতি প্রাবল্যে মারা গিয়েছে। সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। বিশেষতঃ অসুস্থ বালক-বালিকাগণ। কিছু সংখ্যক লোক নানা স্থানে থেকে গিয়েছে। কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হয় নি। নীলাক্ষির শিশুটিও মারা গিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য মায়েরা তাদের শিশুকে হারিয়ে যেমন শাম্বকে অভিসম্পাত দিয়েছিল, নীলাক্ষি তা দেয় নি।

শাম্ব যে-চৌদ্দজনকে নিয়ে ফিরে এলেন, তাদের মধ্যে তিনজন রমণী, দুইটি বালক-বালিকা, বাকি সকলেই পুরুষ। তাদের সকলের বিকৃত দেহে একটি পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। শাম্ব যেমন অনুভব করেছেন, ক্ষীণতর হলেও তাঁর সম্পূর্ণ অসাড় দেহে, এই এক বৎসরের মধ্যে অনুভূতিবোধ ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছে, বাকি চৌদ্দজনের অভিজ্ঞতাও তাঁর মতোই। ভ্রূ বা মস্তকের কেশের ভঙ্গুরতা ও পতন বন্ধ হয়েছে। তাঁর মতো, পুরুষদের সকলের গুম্ফ ও শ্মশ্রুও এখন অভগ্ন ও ঘন। দেহের ক্ষয় ও ক্ষতের বৃদ্ধিলাভ ঘটে নি। যদিও অনেক সঙ্গীকে হারাতে হয়েছে এবং সকলেই শোকার্ত, তথাপি সকলের মধ্যেই নবজীবন লাভের একটি উদ্দীপনা জেগেছে। অথচ সেই উদ্দীপনার মধ্যে কোনরকম উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস নেই। আছে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা, সকলের আচরণে এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য লক্ষণীয়। শাম্বও অন্তরে এক গভীর আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করেছেন। এই নবজন্মের সূচনায়, যেন একটি নতুন সংঘের স্থাপনা ঘটেছে।

রমণীদের মধ্যে এবং সকলের মধ্যেই নীলাক্ষিকে নেত্রীস্থানীয়া মনে হয়। সে হয়ে উঠেছে সর্বাপেক্ষা শ্রীময়ী, মন্দিরের অপ্সরাদের ন্যায় তার সর্বাঙ্গে যেন রূপ ও লাবণ্যের সঞ্চার হয়েছে, অথচ গ্রহরাজের প্রতি তদ্‌গত ভক্তিতে এক ধ্যানমগ্না পূজারিণী। তাকে দেখলে এখন আর বিশ্বাস করা যায় না, সে ছিল বিশ্বাসহীনা, প্রত্যহ যে-কোনো পুরুষের সহবাসে অভ্যস্ত কামতাড়িতা। সকলের মধ্যেই এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে।

সর্বোপরি এক বিশিষ্ট ঘটনা এই, সিন্ধু ও চন্দ্রভাগা সঙ্গমের জলে, শাম্ব পেয়েছেন একটি দারুমূর্তি যাঁর সঙ্গে এই মিত্রবনের গ্রহরাজের মূর্তির আশ্চর্য সাযুজ্য বর্তমান। মাথায় শিরস্ত্রাণ, কপালের ওপর এসে পড়েছে যেন এক খণ্ড বস্ত্রের আবরণ, বিশাল চক্ষুস্বয়, শিরস্ত্রাণের বাইরে বিন্যস্ত কেশপাশের অংশ, মনোহর গুম্ফ, কুঞ্চিত শ্মশ্রু, রাজকীয় পোশাকের কোমরে অভিয়ঙ্গ বন্ধন এবং চরণদ্বয় পাদুকাবৃত। দারুমূর্তিটি মোটেই খুব ছোটখাটো না, একজন দীর্ঘদেহ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় এবং নিতান্ত হালকাও না। বর্ষসমূহে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ন্যায়, শাম্বর মনও সেই মূর্তি প্রাপ্তিতে, যেন এক গভীর সংকেতময় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। জীবনের কিছুই নিরর্থক না। সকল প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ নির্দেশ বর্তমান।

শাম্ব মূর্তি প্রাপ্ত হয়ে, ব্যাকুলিত চিত্তে বক্ষে ধারণ করেছিলেন, আর কখনোই ত্যাগ করেন নি। এই সমস্ত ঋতুগুলো এবং সমস্ত পথপরিক্রমায় দারুমূর্তিটি তিনি স্কন্ধে বহন করেছেন। এক সঙ্গে স্নান করেছেন, এই মিত্রবনের ঋষি-উক্ত তিনটি বিশেষণের দ্বারা প্রত্যহ পূজা করেছেন, সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য।

মিত্রবনের ঋষি শাম্বর সঙ্গীগণসহ প্রত্যাবর্তনে, যেন পরিবার ও স্বজনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে শিশুর ন্যায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। প্রণামের জবাবে তিনি সকলকেই আলিঙ্গন করলেন, রমণীদের মস্তকে ও কপালে হাতের স্পর্শ দিয়ে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করলেন। শাম্বর মূর্তিপ্রাপ্তিতেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি চমৎকৃত, বিস্ময়ে উদ্বেলিত ও চঞ্চল হলেন। শাম্বকে বললেন, 'এই মিত্রবনেই, রমণীয় কানন মধ্যে তুমি এই মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করো। আমি দেখেই বুঝতে পারছি, এ মূর্তি কল্পবৃক্ষের দ্বারা তৈরি। এ নিশ্চয়ই কোনো নিপুণ বিশ্বকর্মার সৃষ্টি। কিন্তু তোমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল।'

শাম্ব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'দায়িত্ব!'

ঋষি তাঁকে এই প্রথম নিজের কুটিরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'বসো। তোমার সঙ্গে আমার একান্তে কিছু কথা আছে। তোমাকে এবার প্রস্তুত হতে হবে আর এক বিরাট পরিশ্রমসাধ্য কাজের জন্য।'

শাম্ব মন্ত্রিকায় জোড়াসনে বসে বললেন, 'আজ্ঞা করুন।'

ঋষি বললেন, 'আজ্ঞা নয়, তোমার আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে হবে। হয় তো মহর্ষি নারদ উপস্থিত থাকলে তিনিই তোমাকে বলতে পারতেন।'

শাম্ব বললেন, 'আপনাকে মহর্ষির তুল্য অভিজ্ঞ মনে হয়। আপনিই আমার কর্তব্যের কথা বলুন।'

ঋষি মহর্ষির উদ্দেশ্যে কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'আমার অভিজ্ঞতা জীবনের তাগিদে। মহর্ষি বিশ্বভ্রমণ করে জ্ঞানলাভ করেছেন। যাই হোক, তোমার নিশ্চয় মনে আছে, তুমি যখন আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে, কেন গ্রহরাজ বিগ্রহের কোনো পূজা হয় না, তোমাকে বলেছিলাম, আমার সে-অধিকার নেই। এখন তোমাকে বলি, সে-অধিকার আছে শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদের। তোমাকে যেতে হবে সেই শাকদ্বীপে, সেখানকার ব্রাহ্মণদের তোমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসতে হবে।'

শাম্ব অজ্ঞতাবশতঃ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কখনো শাকদ্বীপের নাম শুনি নি। সে-স্থান কোথায়, গমনযোগ্য কী না, আপনিই বা সে-স্থানের কথা

কেমন করে জানলেন আমাকে সবই ব্যক্ত করুন।'

ঋষি বললেন, 'সবই তোমাকে বলবো। তোমরা এই যে দ্বাদশস্থান পরিভ্রমণ করলে, স্নান করলে, উপবাসাদি করলে এ সবই প্রাকৃতিক চিকিৎসা রূপে গণ্য হবে। শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা কেবল সূর্যোপাসক নন, এই ব্যাধিকে দেহ থেকে আমূল ধ্বংসের চিকিৎসাবিধি একমাত্র তাঁরাই জানেন। সূর্যালোকের বিবিধ স্থান ও কাল, তাঁরাই নির্ণয় করেছেন, কারণ তাঁরা জানেন, গ্রহরাজই এই সব ব্যাধির নিরাময় করতে পারেন। তাঁরা উপাসনা ও বিবিধ কর্মের দ্বারা এই গুণ আয়ত্ত করেছেন। আমার মনে হয় কখনো কখনো তাঁরা কোনো পরাক্রান্ত রাজার দ্বারা ভারতবর্ষে আনীত হয়েছিলেন, কিন্তু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায়, আবার নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। মিত্রবনের এই মন্দির দেখেই তা বোঝা যায়। কারণ একমাত্র শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণরাই গ্রহরাজবিগ্রহের পূজার অধিকারী।'

শাম্ব অতি কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বললেন, 'মহাত্মন, এ সকল সংবাদই আমার কাছে নতুন। আমি সেই ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণদের দর্শনের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হচ্ছি, কারণ তাঁরাই একমাত্র এই ব্যাধি দেহ থেকে আমূল ধ্বংসের চিকিৎসাবিধি জানেন। এখন বলুন, এঁদের কথা আপনি কেমন করে জানলেন, কোথায় এবং কোন পথেই বা শাকদ্বীপে গমন করা যায়। আমি তাঁদের আনয়নের যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।'

ঋষি বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি, তোমার দ্বারাই তা সম্ভব। শোন, আমি পূর্বপুরুষদের কাছে এই শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদের কথা শুনেছিলাম। সেখানে মগ ও ভোজক দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, উভয় শ্রেণীই সূর্যোপাসক। শুনেছি ভোজক শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্কের ক্ষেত্রে, রক্তের সম্পর্ক মানামানি নেই। এই রীতি আমাদের দেশে সম্মানের চোখে দেখা হয় না, পরন্তু বিরাগ ও বিতৃষ্ণারই সৃষ্টি করতে পারে। তুমি সেখানে গেলেই সব চাক্ষুষ করতে পারবে। পথ নিঃসন্দেহে খুবই দুর্গম। এখান থেকে তোমাকে অন্তরীক্ষে গমন করতে হবে। অন্তরীক্ষ অতিক্রম করে দেবলোক ইলাবৃতবর্ষের নিকটবর্তী কোনো স্থানের নাম শাকদ্বীপ। সেখানে গমন করলে, অধিবাসীরা তোমাকে সম্যক শাকদ্বীপ চিনিয়ে দেবে। শাকদ্বীপ গমনের পূর্বে, তুমি গ্রহরাজ মূর্তিকে কানন মধ্যে স্থাপন করো। তথাপি একটি সমস্যা থেকে যাচ্ছে।'

'কী, বলুন। চেষ্টা করবো, যাতে সমস্যা দূর করা যায়।'

'বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়কে এখানে আনয়ন করে তোমার কল্পবৃক্ষমূর্তির জন্য একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সেই মহান শিল্পীরা বাস করেন। তাঁরা এখানে এসে কাজে হাত দিলে, তাঁদের ভরণপোষণের কী উপায়।'

শাম্ব কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, 'মহাত্মন, অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই-রূপ এক বিশাল কাজ সম্ভব না। আমি একজন ক্ষত্রিয়। ক্ষাত্র ধর্মানুযায়ী আমি শত্রুকে নিধন ও পরাজিত করে, তাদের ধনসম্পত্তি সকল লাভ করেছি। এই কাজে কি আমি সেই সকল ধনসম্পদ ব্যয় করতে পারি না?'

ঋষি বিস্মিত ও অত্যুৎসাহী হয়ে বললেন, 'তুমি এবং তোমার নিজের যা কিছু সংগ্রহ, সকলই তুমি এ বিশাল যজ্ঞকাণ্ডে ব্যয় করতে পারো।'

শাম্ব এখন ঋষির নিকটে নিজের পরিচয় দিলেন এবং পিতার অভিশাপের বিষয়ের বর্ণনা করলেন। বললেন, 'মহাত্মন, জন্মসূত্রে আমি বাসুদেবপুত্র, যদু-

বংশের বৃষ্ণিশাখার বংশধর। ক্ষাত্রবীর্যের স্পর্ধা, প্রণয়শীলা রমণীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত সুখী ও বিলাসের জীবন এখন আমার কাছে অতীত স্মৃতিমাত্র। তা আমাকে আকর্ষণ করে না, বিচলিত করে না। যে কল্পারম্ভের দ্বারা আমি কর্ম ও মোক্ষলাভের পথে চলেছি আমার গৌরব তা ছাড়া আর কিছু নেই।'

ঋষি শাম্বকে আলিঙ্গন করে, চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'সাধু সাধু!'

শাম্ব ঋষিকে প্রণাম করে বললেন, 'আমি এখন অশ্বচালনায় সমর্থ। এ অঞ্চল থেকে অশ্ব সংগ্রহ করে, আমি অবিলম্বে দ্বারকায় যাবো। ধনসম্পদ নিয়ে পশ্চিম দক্ষিণাঞ্চলের বিশ্বকর্মাগণকে আমার অভিপ্রায় নিবেদন করবো। এখানে ফিরে এসে, আমি কালমাত্র অপেক্ষা না করে, শাকদ্বীপে যাবো। নীলাক্ষি এবং অন্যান্য সকলে এখানে থাকবে, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম ও অন্যান্য সকল কাজের প্রতি লক্ষ ও যত্ন করবে।'

ঋষি বললেন, 'মাত্র কয়েকদিন পরেই শুক্লা সপ্তমী তিথি। তুমি সেইদিন তোমার কল্পবৃক্ষমূর্তি কানন মধ্যে কোনো উৎকৃষ্ট স্থানে স্থাপন করে দ্বারকায় গমন করো। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

শাম্বর সঙ্গে ঋষির কথার পরে, এক নতুন কর্মযজ্ঞের সূচনা হলো। শাম্ব তাঁর সঙ্গীদের সবাইকেই তাঁর পরিচয় দিলেন, ইচ্ছার কথা জানালেন। সকলের যা কিছু কাজ সবই বুঝিয়ে দিলেন। সপ্তমী তিথিতে উপবাস করে, চন্দ্রভাগা-কূলের কানন মধ্যে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। পরদিবসেই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বেগবান অশ্বে আরোহণ করলেন। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে, নীলাক্ষির মুগ্ধ ও বিস্মিত চোখের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিবিনিময় হলো। শাম্ব গম্ভীর হলেন, নীলাক্ষির সামনে গমন করলেন। বললেন, 'নীলাক্ষি, তোমার চোখে এই মুগ্ধতা কিসের?'

নীলাক্ষি বললো, 'মানুষের। তাকিয়ে দেখ, সকলেই তোমার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছে।'

শাম্ব দেখলেন, নীলাক্ষি মিথ্যা বলে নি। তথাপি নীলাক্ষির চোখে মুখে যেন প্রকৃতি লক্ষণ অতি গাঢ়তর মনে হলো। একি নিতান্ত তাঁরই ভ্রম? নীলাক্ষি আবার বললো, 'আমি তোমার শুভযাত্রা কামনা করছি। কাজ শেষ করে তুমি দ্রুত ফিরে এসো।'

শাম্ব নীলাক্ষির দিকে আবার তাকালেন। নীলাক্ষি হেসে বললো, 'আমাকে ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই।'

শাম্বও হাসলেন, বললেন, 'আমরা সকলেই মানুষ, ভুল আমারও হতে পারে। কিন্তু আমাদের কল্প কর্ম শেষ হতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে।'

নীলাক্ষি বললো, 'অনর্থক চিন্তা করো না। তোমার শুভযাত্রা ত্বরান্বিত কর।'

শাম্ব আশ্বস্ত হয়ে অশ্বচালনা করলেন। এক পক্ষকাল মধ্যে তিনি দ্বারকায় পৌঁছলেন। বাসুদেব পুত্র দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। জাম্ববতী শাম্বকে আলিঙ্গন করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করলেন এবং মাতৃগণ সকলেই তাঁকে অশেষ সাধুবাদের দ্বারা স্নেহ ও সোহাগ জানালেন। শাম্বর নিজ গৃহে উৎসবের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু শাম্ব একদিন মাত্র দ্বারকায় অবস্থান করবেন জেনে তাঁর অন্তঃপুরে যেন শোকের ছায়া নেমে এলো। সংবাদ

পেয়ে বাসুদেবও বিস্মিত উদ্বেগে দেখা করতে এলেন।

শাম্ব পিতা, মাতৃগণ, লক্ষ্মণা ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকা রমণীগণের সামনেই তাঁর আগমনের কারণ ও আসন্ন কর্মের কথা সব ব্যক্ত করলেন। তিনি সকলের সম্মতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা করলেন। বাসুদেব ম্রিয়মান হলেন, কিন্তু শাম্বর কল্পের কথা শুনে, তাঁকে বাধা দিতে পারলেন না, বরং সম্মান করলেন। জাম্ববতীর অন্তর বিদীর্ণ হলো, তথাপি তিনি স্বামীর কথানুযায়ী সম্মতি দিলেন।

লক্ষ্মণা অতি কাতর হয়ে দুই হাতে শাম্বকে আকর্ষণ করে, কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'স্বামী, আমি কী নিয়ে এই দ্বারকায় থাকবো? কেন থাকবো? কতোকাল থাকবো?'

শাম্ব লক্ষ্মণাকে নানাবাক্যে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'কুরুকন্যা, শোন, আমার ব্রত এখনো শেষ হয়নি। আমাকে দেখেই তুমি বুঝতে পারছো, আমার এখনো মুক্তি ঘটেনি। নিতান্ত অর্থের প্রয়োজনেই আমি এখানে এসে-ছিলাম। আমার অতীত জীবন আর কখনোই ফিরে আসবে না। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে যে-কোনো সময় পঞ্চনদীর দেশে, চন্দ্রভাগাতীরে মিত্রবনে এসো। সেখানেই তোমার যদি বাস করতে ইচ্ছা হয়, বাস করো। আরও শোন লক্ষ্মণা, জীবন কখনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না, তা সতত সঞ্চরমান, পরিবর্তনশীল। তুমি তপোবনে গেলে, রৈবতকের এই হর্ম্যতলের বিলাসকক্ষের জীবন পাবে না। তোমার স্বামীকেও পূর্বের ন্যায় পাবে না। তোমাকে বলেছিলাম, অভিশাপ প্রশ্নের অতীত। এখন তুমি একমাত্র আমার অমোঘ নিয়তির সঙ্গেই মিলিত হতে পারো।'

শাম্ব দ্বারকায় এক রাত্রি বাস করলেন। যদুবংশের বিশিষ্ট পুরুষ জ্যেষ্ঠ ও ভ্রাতৃগণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। পরের দিন তিনি রথারোহণে তাঁর বিবিধ সুবর্ণ, মণিমুক্তা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। মিত্রবনের পথে যাত্রা করে তিনি বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর যাবতীয় রত্নাদি ও রথ তাঁদের পারিশ্রমিক হিসাবে দান করে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা জানালেন। বিশ্বকর্মা সম্প্রদায় প্রীতির সঙ্গে মিত্রবনে গিয়ে মন্দির তৈরি করতে স্বীকৃত হলেন।

শাম্ব আর এক পক্ষকালের মধ্যে অশ্বারোহণে মিত্রবনে পৌঁছে, একটি সপ্তমী-তিথি পর্যন্ত অবস্থান করলেন। অষ্টমী তিথিতে সকলের সম্মতি নিয়ে পদব্রজে শাকদ্বীপ যাত্রা করলেন। পঞ্চনদীর দেশের সমতলভূমি অতিক্রম করে, হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছতে তাঁর মাসাধিকাল কেটে গেল। শুরু হলো অন্তরীক্ষের পথ। অতি দুর্গম গিরিশিখর ও বনভূমির মধ্য দিয়ে গমনের সময় শাম্ব তাঁর জীবনে এক অনন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। অন্তরীক্ষের পার্বত্যপথ অতি দুর্গম, কিন্তু শান্ত ও গম্ভীর। দৃশ্যাবলী অতি মনোমুগ্ধকর। ফলমূল এবং পার্বত্য ঝরনার জলই তাঁর খাদ্য ও পানীয়। তবে যতোই অন্তরীক্ষ নিকটবর্তী হতে লাগলো, সেখানকার অধিবাসী গন্ধর্বদের সাক্ষাৎ পেতে লাগলেন। গন্ধর্ব রমণী ও পুরুষরা সকলেই অতি মনোহর রূপ। ধবল গিরিশৃঙ্গে প্রথম আদিত্য কিরণ-পাতে যে বর্ণ ধারণ করে এদের গাত্রবর্ণ সেইরকম। কেশ এবং চক্ষু নিবিড় কৃষ্ণ। অশ্বযুক্ত রথ, অশ্ব ছাড়াও কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ পার্বত্য ছাগ পৃষ্ঠে অনেকে গমনাগমন করে। প্রকৃত অন্তরীক্ষ পর্বত মধ্যস্থিত এক বিশাল উপত্যকাভূমি। সুদীর্ঘ হ্রদ ও একটি বেগবতী নদীতে গন্ধর্বরা নৌকারোহণেও চলাচল করে।

শাম্ব স্বভাবতই এই অপরিচিত জাতি সম্পর্কে শঙ্কিত ও চিন্তিত ছিলেন।

কিন্তু তাঁর আশঙ্কার কোনো কারণ ছিল না। অন্তরীক্ষের অধিবাসীরা সকলেই তাঁর সঙ্গে ভালো আচরণ করেছে। তাঁর শারীরিক বিকৃতির জন্য কেউ ঘৃণা করে নি। খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছে। পথ দেখিয়ে দিয়েছে এবং সাবধান করে দিয়েছে, ইলাবৃতবর্ষের অধিবাসীদের সঙ্গে অসুরদের প্রায়ই যুদ্ধ চলছে। শাম্ব যেন সাবধানে গমন করেন।

শাম্ব এই বিচিত্র পার্বত্যদেশসমূহ ও তার অধিবাসীদের দেখে দুর্গম পথের ক্লান্তি অনেকখানি ভুলে থাকতে পেরেছেন। উত্তর পশ্চিমের নির্দিষ্ট পথে যেতে গিয়ে তিনি অসুর সৈন্যদের অনেকগুলো অবরোধ সৃষ্টিকারী স্কন্দাবার দেখতে পেয়েছেন। তাঁকে সর্বত্রই নিজের পরিচয়, গন্তব্য ও গন্তব্যস্থলে গমনের কারণ-সমূহের বিবরণ দিতে হয়েছে। অসুরদের সীমানা অতিক্রমের পরে শাকদ্বীপে গমনের আগে সুরসেনাদের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। স্বর্গের প্রতিটি মানুষেরই তিনি পদধূলি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের ব্যবহার খুব ভালো ছিল না।

দশ ঋতু অতিক্রান্ত করে, শাম্ব শাকদ্বীপে পেঁছুলেন। দেখলেন, সে স্থানের অধিবাসীদেরও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘকান্তি। চোখের রঙ মিশ্রিত, কৃষ্ণ নীল এবং গোমেধ বর্ণ। অন্তরীক্ষের অধিবাসীদের তুলনায় স্বর্গলোকের দেবতাদিগের সঙ্গেই শাকদ্বীপের মানুষদের সাদৃশ্য বেশি। শাম্বকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত করলো শাক-দ্বীপ মগ ব্রাহ্মণদের বেশবাস। পুরুষদের কাঁধ থেকে পায়ের কনুই পর্যন্ত পোশাকের কোমরে অভিন্নভাগের বন্ধন। পায়ে পাদুকা। মাথার ওপরে কপাল পর্যন্ত একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা আবৃত। সকলেরই জটা ও শ্মশ্রু রয়েছে এবং প্রতিদান পুরুষক ও বর্ম ধারণ করে থাকেন।

শাম্ব মগ সম্প্রদায়শ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণের পাদ্যার্ঘ গ্রহণ করে তাঁকে পরিচয় এবং আগমনের কারণ সকল ব্যক্ত করলেন। এবং করুণ ও বিনীতভাবে তাঁর প্রার্থনা জানালেন। তাঁর আচরণে মগশ্রেষ্ঠ প্রীত হলেন। বিভিন্ন পরিবারকে আহ্বান করে আলাপ আলোচনা করলেন। তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, সুদূর ভারতবর্ষে তাঁদের যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠা করা হবে কী না? এবং কতোজনকে শাম্ব নিয়ে যেতে চান?

শাম্ব বললেন, 'আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনাদের কেউ কখনো ভারতবর্ষে গমন করে থাকবেন। হয় তো আপনাদের প্রতিষ্ঠা ও যত্নের অব্যবস্থায় আপনারা বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু আমি এক কল্প করে আপনাদের আহ্বান করতে এসেছি। আপনাদের প্রতিষ্ঠা ও যত্নের কোনোরকম ত্রুটি হবে না। আমি আপনাদের গৃহ, গার্হস্থ্যজীবনধারণের সমস্ত ব্যবস্থাদি করবো। কর্ষণযোগ্য ভূমি ও গাভী দান করবো। আপনারা অষ্টারোজন ব্রাহ্মণ, আপনাদের পরিবারবর্গ নিয়ে চলুন। আমাদের বিশাল দেশে এই মহাব্যাধির অতি প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আপনারাই এক-মাত্র এই মহাব্যাধির আমূল ধ্বংস করতে পারেন। আমার ব্যাকুল প্রার্থনা আপনারা রক্ষা করুন।'

মগ ব্রাহ্মণগণ শাম্বর কথা বিবেচনা করলেন। শাম্ব বহু দূরদেশ থেকে অমানুষিক ক্লেশ সহ্য করে তাঁদের নিতে এসেছেন। শাম্বর ব্যবহার আচরণ কথা-বার্তায় তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদিত হলো। পরিবারস্থ মহিলাগণ শাম্বর প্রতি প্রীত হলেন। মগ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অষ্টাদশ পরিবারকে শাম্বর সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন, এবং তাঁদের গমনের প্রস্তুতিপর্বের মধ্যেই শাম্বর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বললেন।

শাম্বর শাকদ্বীপে যেতে যতো বিলম্ব হয়েছিল, ফিরে এলেন তার থেকে দ্রুত। কারণ আঠারোটি পরিবার তাঁদের অশ্ব পার্বত্য গর্দভ ও বিরাটাকৃতি ছাগ, অর্ণব-চালিত রথে ভারতবর্ষে এলেন। অস্তাচলমানস্থানের মিত্রবনে ফিরে শাম্ব দেখলেন, এক বিশাল রথের ন্যায় মন্দির অনেকখানি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অগ্নিহোত্র গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন তাঁর জন্য বাকি ছিল। তিনি ফিরে আসায় সে-কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলো।

মিত্রবনের ঋষি ও সকলেরই শাম্বর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তাঁর রূপের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর উজ্জ্বলবর্ণে চারিপার্শ্বের প্রকৃতি, নদী, নরনারী সকলই যেন প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এই রূপই শাম্বর সেই প্রকৃত রূপ। তাঁর রূপ-দর্শনে সকলে মোহিত হয়ে তাঁকে স্পর্শ করার জন্য ব্যাকুল হলো।

নীলাক্ষি শাম্বর পদধূলি নিয়ে বললো, 'প্রণাম হে বিবস্বান।'

শাম্ব চমকিত হয়ে বললেন, 'নীলাক্ষি, ওই নামে আমাকে কখনো সম্বোধন করো না। এক মহাপরাক্রান্ত রাজা ও গ্রহরাজ ছাড়া ওই নাম আর কারোর হতে পারে না।'

'কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সেই রূপের কথাই মনে হচ্ছে।' নীলাক্ষি বললো।

শাম্ব বললেন, 'তুমি আমাকে শাম্ব নামে সম্বোধন করবে।'

নীলাক্ষি বললো, 'না, তোমাকে আমি এখন থেকে বৃষ্কিরত্ন বলে ডাকবো।'

শাম্ব বললেন, 'সেই ভালো।'

কিন্তু শাম্বর কার্য সমাধার অবকাশ কম ছিল। মিত্রবনের ঋষির সঙ্গে আলোচনান্তে তিনি মগদের ছয়টি পরিবারকে মিত্রবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাকি বারোটি পরিবার ও বিশ্বকর্মা বংশধরদের নিয়ে প্রথমে যাত্রা করলেন মথুরার সন্নিকটে যমুনার দক্ষিণ তীরে। সেখানে একটি অগ্নিহোত্র গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ছয়টি মগ ব্রাহ্মণ পরিবারকে প্রতিষ্ঠা করলেন। বিশ্বকর্মা বংশধর-দের, যাঁদের সঙ্গে এনেছিলেন, তাঁদের একাংশের কাছে প্রার্থনা করলেন, এই কাল-প্রিয় স্থানে একটি মন্দির আপনারা তৈরি করুন।'

এক মহাযজ্ঞ যখন শুরু হয় তখন সকলের হৃদয়ে ও মনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। বিরোধ এবং আলস্য সেখানে কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। বিশ্বকর্মাগণ স্বীকৃত হলেন। অতঃপর শাম্ব, বাকি ছয়টি মগ ব্রাহ্মণ পরি-বারকে নিয়ে উদয়াচলের ওড্রদেশে লবণদধির তীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রাচী নদীর একটি শাখা চন্দ্রভাগা নামে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। এখানে তিনি অবশিষ্ট ছয়টি মগ পরিবারকে প্রতিষ্ঠা করলেন। শেষ বিশ্বকর্মা বংশধরগণ যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও সেখানে একটি মন্দির তৈরি করতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা সম্মত হলেন। শাম্ব এখানেও একটি অগ্নিহোত্র গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন।

এক বছর পরে তিনি যখন মিত্রবনে ফিরে এলেন তখন দেখলেন, সেখানে একটি ছোটখাটো নগরী সৃষ্টি হয়েছে, সকলেই তার নাম দিয়েছে শাম্বপুর। শাম্ব বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হলেন না, কারণ তাঁর এরকম কোনো অভিপ্রায় ছিল না। বরং তিনি দেখে সুখী ও চমৎকৃত হলেন, মগ ব্রাহ্মণদের চিকিৎসায় সকলেই পূর্ণ-রূপে আরোগ্যলাভ করেছে। সকলেই যেন দিব্যমূর্তি ধারণ করেছে। এবং কল্প-বৃক্ষ মূর্তির নিত্য পূজাদি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে।

মিত্রবনের ঋষির নির্দেশ মতো শাম্ব প্রতি চার মাসে তিনস্থানে বৎসরান্তে ভ্রমণ করতে লাগলেন। মূলস্থান-মিত্রবন, কালপ্রিয়-কালনাগক্ষেত্র, উদয়াচলের সমুদ্রতীরে কোণবল্লভ ক্ষেত্র। এই সময় তাঁর সঙ্গে আদি চোদ্দজন তিন স্থানেই গমনাগমন করলো।

দ্বাদশ বৎসর শেষে তিনটি মন্দির পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। নীলাক্ষি উদয়াচলের মন্দিরে আজীবন বাস করার প্রার্থনা জানালো। শাম্ব বললেন, 'তুমি যেখানে থেকে গ্রহরাজকে সেবা করে সুখী থাকবে, সেখানেই থাকো।'

নীলাক্ষি বললো, 'আমি এই সমুদ্র ও চন্দ্রভাগা তীরের মধ্যবর্তী স্থলেই থাকতে চাই। বৃষ্কিরত্ন, আমি আজীবন কোণাদিত্যের পূজা করবো, কিন্তু আমি নিতান্ত প্রস্তরের অপ্সরামূর্তি নই। আমি মানুষ, তুমি আমার মহামৈত্র। তোমার দর্শনের আশায় আমার প্রাণ ব্যাকুলিত হবে। বৎসরান্তে একবার দেখা দেবে তো?'

শাম্ব দেখলেন, নীলাক্ষির ঘনকৃষ্ণপক্ষ্মযুক্ত নীলচক্ষুদ্বয় অশ্রুকণায় চিকচিক করছে। শাম্ব হৃদয়ে অনুভব করলেন, এক অনাসক্ত অথচ কাতর আবেগ। বললেন, 'নীলাক্ষি, মিত্রবনের প্রথম এবং দ্বিতীয় রাত্রের কথা আমি ভুলি নি। তুমিও আমার অতি শক্তিময়ী মমতাময়ী মৈত্র। তুমি বিনা আজ এ সার্থকতা সম্ভব ছিল না।'

নীলাক্ষি শাম্বর পদযুগল স্পর্শ করে বললো, 'শক্তির কথা বলো না, তুমিই আমার শক্তি। তবে আজ থেকে এই কোণাদিত্যক্ষেত্রের নাম হোক মৈত্রেয়বন।'

শাম্ব আনন্দিত হয়ে বললেন, 'নীলাক্ষি, অপরূপ তোমার কল্পনা, এর অধিক ভালো নাম আর এ স্থানের হয় না।'

নীলাক্ষি বললো, 'হে মৈত্রেয়, যে কারণে এ স্থানের নাম আজ থেকে মৈত্রেয়বন, সেই কারণ রক্ষা করো।'

শাম্ব নীলাক্ষির কপালে ডান হাত স্পর্শ করে বললেন, 'মৈত্রেয় কখনো মৈত্রেয়কে মিথ্যা বা শ্বিধাসূচক কথা বলে না।'

নীলাক্ষি অশ্রুপূর্ণ চোখে হাসলো। মৈত্রেয়বনে বাতাস শনশন নিস্বনে প্রবাহিত হচ্ছে। কোণাদিত্য যেন তাকেই স্নেহপূর্ণ লোচনে অবলোকন করছিলেন।

মহর্ষি নারদ এলেন মিত্রবনে। মন্দিরকে কেন্দ্র করে শাম্বপুর নগরী এখন ক্রমবর্ধমান। শাম্ব নারদকে অভ্যর্থনা করলেন, পূজা করে পাদার্ঘ গ্রহণ করলেন। মহর্ষি বললেন, 'শাম্ব, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তুমি কি আর কখনো দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করতে চাও না? সেখানে রাজকীয় সুখভোগ করতে চাও না?'

শাম্ব বললেন, 'মহর্ষি, আমার আর ঐশ্বর্যপূর্ণ দ্বারকায় রাজকীয় সুখভোগের কোনো বাসনা নেই। আমি এই মিত্রবনে, কালপ্রিয়ক্ষেত্রে ও মৈত্রেয়বনে এক অপরূপ আনন্দে অতিবাহিত করছি। মগ ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হয়েছে, ব্যাধিগ্রস্তরা চিকিৎসিত হচ্ছে এবং তিন স্থানের তিনকালের আলোকে স্নান করছে। অভিশাপ কী, ব্যাধি কী, আমি তা জেনেছি, অতএব এখন যা দেখছি, এর তুল্য আনন্দ আমার আর কিছু নেই।'

মহর্ষি মুগ্ধবিস্ময়াপন্ন চোখে শাম্বর মুখের দিকে দেখলেন, বললেন, 'চলো,

আমি তোমার প্রতিষ্ঠিত গ্রহরাজকে পূজা করবো।'

'চলুন।' শাম্ব ব্যস্ত হয়ে পূজাদির নানা উপকরণ নিয়ে মহর্ষিকে অনুসরণ করলেন।

মহর্ষি চন্দ্রভাগার জল ও ফুলপত্রাদি সহ কৃতাঞ্জলিপুটে হয়ে সেই কল্পবৃক্ষ মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি গ্রহরাজকে সম্বোধন করে উচ্চারণ করলেন, 'হে সর্বদেবমান্য, সর্বভূতমান্য, সর্বশ্রুতিমান্য, হে শাম্বাদিত্য! আপনি সন্তুষ্ট হোন, আমার পূজা গ্রহণ করুন।'

শাম্বর সারা শরীর শিহরিত হলো। শাম্বাদিত্য! এ কী নামে মহর্ষি গ্রহরাজকে সম্বোধন করলেন?

মহর্ষি শাম্বকে স্পর্শ করে বললেন, 'হ্যাঁ, আজ থেকে এই বিগ্রহের আর এক নাম শাম্বাদিত্য। এই নামেই তিনি এখানে পূজিত হবেন।'

শাম্ব তাঁর অভিশাপের দিনেও অশ্রুমোচন করেন নি। আজ এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে অশ্রুপাত রোধ করা কঠিন বোধ হলো। তিনি দেখলেন মহর্ষির দুই চোখও অশ্রুপূর্ণ, মুখে অনির্বচনীয় হাসি। তিনি ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বাইরে চলে গেলেন।